মূল মুদ্রণের পূর্বের কপি

প্রশিক্ষণ মডিউল

কমিউনিটি প্যারামেডিক-২০১৮

প্রথমপ্রত্র

এনাটমি ও ফিজিওলজি. ফার্মাকোলজি. মাইক্রোবায়োলজি. প্যাথলজি. বায়োকেমিস্ট্রি

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

প্রিন্ট: ২৪-০১-২০১৯

কমিউনিটি প্যারামেডিকদের
মৌলিক প্রশিক্ষণ

বিষয় : ১

মৌলিক বিষয়সমূহ

এনাটমি ও ফিজিওলজি. ফার্মাকোলজি. মাইক্রোবায়োলজি. প্যাথলজি. বায়োকেমিস্ট্রি

অধ্যায় ১ ঃ এনাটমি ও ফিজিওলজি

পাঠ ১ :	এনাটমি ও ফিজিওলজি	৭
পাঠ ২	কোষ, কোষের গঠন ও কার্যাবলী	৮
পাঠ ৩	কলা, অংগ এবং তন্ত্র	১১
পাঠ ৪	মানব দেহের বিভিন্ন অংশ এবং কতিপয় পরিভাষা	১৪
পাঠ ৫	ত্বক তন্ত্র ও ত্বকের গঠন	১৬
পাঠ ৬	ত্বকের কার্যাবলী	১৮
পাঠ ৭	অস্থি, অস্থির প্রকারভেদ ও অস্থি-মজ্জা	১৯
পাঠ ৮	কঙ্কাল তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং উহার কার্যাবলী	২২
পাঠ ৯	সন্ধি, সন্ধির প্রকারভেদ ও সন্ধির নড়াচড়া	২৯
পাঠ ১০	পেশী, পেশীর প্রকারভেদ এবং কার্যাবলী	৩৩
পাঠ ১১	যে সব পেশীতে ইনজেকশন দেয়া হয় তার পরিচিতি	৩৫
পাঠ ১২	রক্তসংবহন তন্ত্রের গঠন	৩৭
পাঠ ১৩	হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন, নাড়ী এবং রক্তচাপ	৪০
পাঠ ১৪	রক্তের উপাদান ও কার্যাবলী	৪৩
পাঠ ১৫	লসিকা তন্ত্র ঃ লসিকা নালী, লসিকা গ্রন্থি এবং প্লীহা	৪৬
পাঠ ১৬	বক্ষের গঠন এবং শ্বাস তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ	৪৮
পাঠ ১৭	শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া, শ্বাস তন্ত্রের কার্যাবলী এবং নাকের আশে পাশের সাইনাস	৫৩
পাঠ ১৮	পরিপাক তন্ত্রের গঠন	৫৭
পাঠ ১৯	পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী	৫৯
পাঠ ২০	পরিপাক তন্ত্রের প্রধান কাজ এবং উদরের গঠন	৬১
পাঠ ২১	মূত্র তন্ত্রের গঠন, কার্যাবলী, মূত্র উৎপাদন ও পরিবহন	৬৩
পাঠ ২২	পেলভিস	৬৯
পাঠ ২৩	স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র	৭৫
পাঠ ২৪	হরমোন এবং স্ত্রী হরমোনসমূহের নাম ও কার্যাবলী	৭৪
পাঠ ২৫	ঋতু চক্র ও ঋতু স্রাব	৭৬
পাঠ ২৬	পিউবার্টি, মেনার্কি ও মেনোপজ	৭৭
পাঠ ২৮	স্তন ঃ গঠন ও কার্যাবলী	৭৮
পাঠ ২৮	পুরুষ প্রজনন তন্ত্র	৮০
পাঠ ২৯	এন্ডোক্রাইন তন্ত্র	৮২
পাঠ ৩০	স্নায়ু তন্ত্র	৮৬
পাঠ ৩১	সংবেদনবাহী অঙ্গসমূহ এবং চোখ	৯০
পাঠ ৩২	কান	৯৩

পাঠ ৩৩	দাঁত	৯৫
পাঠ ৩৪	শারীরিক অসুস্থতা ও এর কারণ	৯৮

অধ্যায় ২ ঃ ফার্মাকোলজি

পাঠ ১	মৌলিক ফার্মাকোলজি	১০১
পাঠ ২	ঔষধ ও বিভিন্ন রোগে ব্যবহৃত ঔষধের পরিচিতি	১০৩
পাঠ ৩	অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ	১০৭
পাঠ ৪	ঔষধ প্রয়োগের পথসমূহ	১১২
পাঠ ৫	শিরায় (I/M) ব্যবহৃত সাল্যাইনসমূহের পরিচিতি ও ব্যবহারবিধি	১১৬
পাঠ ৬	ঔষধের মাত্রা ও বিরুদ্ধ ইঙ্গিতসমূহ	১২০
পাঠ ৭	ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার	১২৩
পাঠ ৮	পরামর্শ দান প্রক্রিয়া, প্রেসক্রিপশন লেখা এবং ঔষধ সেবনের নিয়ম	১২৭
পাঠ ৯	ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, সংবেদনশীলতা ও এলার্জির ব্যবস্থাপনা	১৩১
পাঠ ১০	এন্টিবায়োটিক ঔষধের পরিচিতি ও ব্যবহার বিধি	১৩৪
পাঠ ১১	স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনের পূর্বে ব্যবহৃত ঔষধের পরিচিতি	১৩৫
পাঠ ১২	কমিউনিটিতে ব্যবহৃত ঔষধসমূহ	১৩৯

অধ্যায় ৩ ঃ মাইক্রোবায়োলজি বা অণুজীব বিজ্ঞান

পাঠ ১	মাইক্রোবায়োলজি ঃ সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ	১৪৫
পাঠ ২	অণুজীবের স্থানান্তর ও বিস্তার	১৪৯
পাঠ ৩	সংক্রমণের ফলাফল, নিয়ন্ত্রক ও বহিঃপ্রকাশ	১৫০
পাঠ ৪	ব্যাকটেরিয়ার ধ্বংস সাধন	১৫৪

অধ্যায় ৪ ঃ প্যাথলজি

পাঠ ১	প্যাথলজি ও প্যাথলজিস্ট	১৫৮
পাঠ ২	রক্ত	১৬০
পাঠ ৩	রোগ নির্ণয়ে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা	১৬৯
পাঠ ৪	ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগসমূহ	১৭৭

অধ্যায় ৫ ঃ বায়োকেমিস্ট্রি

পাঠ ১	ভূমিকা এবং সংজ্ঞা	১৮০
পাঠ ২	ক্লিনিকাল বায়োকেমিস্ট্রি	১৮২

Abbreviations

ACTH	Adreno Cortico Trophic Hormone
ADH	Anti-Diuretic Hormone
BP	Blood Pressure
BCC	Behaviour Change Communication
CNS	Central Nervous System
D/A	Dextrose in Normal Saline
DDS Kit	Drugs & Dietary Supplement Kit
EPI	Expanded Program of Immunization
FWC	Family Welfare Centre
FWV	Family Welfare Visitor
FGD	Focus Group Disscusion
GH	Growth Hormone
Hb	Haemoglobin
I/M	Intra Muscular
I/V	Intra Venous
I/D	Intra Dermal
IEC	Information Education and Communication
IPC	Inter Personal Communication
IUD	Intra Uterine Device
MP	Menstrual Period
MC	Menstrual Cycle
MCWC	Mother & Child Welfare Center
MR	Menstrual Reglation
MCH	Maternal & Child Health
ORS	Oral Rehydration Salt

PNS	Peripheral Nervous System
P/V	Per Vaginal
P/R	Per Rectal
RBC	Red Blood Cell
S/C	Sub Cutaneous
SBC	Social Behaviour Communication
TH	Thyroid Hormone
UB	Urinary Bladder
WBC	White Blood Cell

অধ্যায় ১ ঃ এনাটমি ও ফিজিওলজি

পাঠ - ১
এনাটমি ও ফিজিওলজি

এনাটমি (Anatomy)

যে বিদ্যা পাঠ করে আমরা মানবদেহের গঠন সম্পর্কে জানতে পারি, তাকে এনাটমি বলে। যা দ্বারা মানবদেহের গঠন তৈরী হয় তা নীচে উল্লেখ করা হলো:

১) কোষ (যা খালি চোখে দেখা যায় না, মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে হয়)
২) কলা, অংগ এবং তন্ত্র
৩) অস্থি
৪) সন্ধি
৫) পেশী
৬) রক্ত
৭) রক্ত সংবহন তন্ত্রের গঠন ঃ হৃদপিন্ড, শিরা, ধমনী ও কৈশিকনালী
৮) লসিকা তন্ত্র ঃ লসিকা গ্রন্থী, লসিকা নালী এবং প্লীহা
৯) বক্ষের গঠন
১০) শ্বাস তন্ত্র
১১) পরিপাক তন্ত্র
১২) মূত্র তন্ত্র
১৩) বস্তিকোঠর বা পেলভিস
১৪) স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র
১৫) স্তনের গঠন
১৬) পুরুষ প্রজনন তন্ত্র
১৭) বহি:ক্ষরা গ্রন্থি বা নালীযুক্ত গ্রন্থি
১৮) অন্ত:ক্ষরা গ্রন্থি
১৯) স্নায়ু তন্ত্র
২০) সংবেদনবাহী অংগসমূহ ঃ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা এবং ত্বক

ফিজিওলজি (Physiology)

যে বিদ্যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি মানবদেহের এই গঠন কিভাবে কাজ করে, তাকে ফিজিওলজী বলে।

ভ্রুণবিদ্যা (Embriology)

যে বিদ্যার মাধ্যমে আমরা গর্ভস্থ শিশুর ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারি, তাকে ভ্রূণবিদ্যা বলে।

পাঠ - ২
কোষ, কোষের গঠন ও কার্যাবলী

কোষ (Cell)

দেহের গঠন ও কার্যাবলীর ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে কোষ। মানব দেহ লক্ষ লক্ষ কোষের সমন্বয়ে গঠিত। দেহের কোষ বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলী সম্পাদন করে। যেমন- শক্তি উৎপাদন, পেশীর সংকোচন, স্নায়ু অনুভূতি প্রেরণ, এনজাইম, হরমোন নিঃসরণ ইত্যাদি।

কোষ তার কার্যাবলী অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। কোন কোনটা হয় বৃত্তাকার বা গোল (Round), কোন কোনটা ডিম্বাকৃতি (Oval), আবার কোন কোনটা লম্বা ধরণের (Tall), কোনটা রড (Rod) এর আকৃতির, তাছাড়াও কোষ আরও অনেক আকৃতির হয়ে থাকে।

কোষের গঠন

কোষ একটি অতিক্ষুদ্র সজীব বস্তু যার রয়েছে একটি কোষ আবরণ (Cell Membrane), নিউক্লিয়াস (Nucleus) এবং সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)।

কোষ আবরণ ঃ প্রতিটি কোষ একটি আবরণ বা ঝিল্লি দ্বারা বেষ্ঠিত। আবরণটি লিপিড এবং আমিষ সহযোগে গঠিত। এই আবরণ কোষ এবং এর পরিবেশের মধ্যে প্রতিবন্ধক (Barrier) হিসাবে কাজ করে। এই আবরণের মধ্য দিয়ে খাদ্য (যেমন- অ্যামাইনো এসিড) এবং গ্যাস (যেমন- অক্সিজেন) কোষের ভিতর প্রবেশ করে। আবার অপ্রয়োজনীয় পদার্থ কোষ থেকে নিঃসৃত বা বাহির হয় (যেমন- কার্বন ডাই অক্সাইড) এবং বিপাক ক্রিয়ায় উৎপাদিত পদার্থ এই পথেই নির্গত হয়। কোষ আবরণ কোষের আকৃতি ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং আন্ত-কোষীয় যোগাযোগ রক্ষা করে।

নিউক্লিয়াস ঃ প্রতিটি কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত একটি আবরণী দিয়ে ঘেরা অংশকেই নিউক্লিয়াস বলা হয়। নিউক্লিয়াসের ভিতরে অবস্থিত বিশেষ অংশ ক্রোমোজমের মাধ্যমেই এক বংশ থেকে পরবর্তী বংশে বিভিন্ন প্রকৃতি বা গুণাগুণ সঞ্চারিত হয়। কোষ বিভাজনে এটা অত্যাবশ্যকীয়। কোষের একটি মাত্র নিউক্লিয়াস থাকে।

সাইটোপ্লাজম ঃ কোষ আবরণ ও নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থানকারী জেলীর মত অংশের নাম সাইটোপ্লাজম। নিম্নলিখিত সজীব বস্তুগুলো সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকেঃ

*	মাইটোকন্ড্রিয়া	*	গলজি বডি
*	এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা	*	লাইসোজম
*	কোষ গহ্বর	*	ক্রোমাটিন জালিকা

*　　সেন্ট্রওল　　　　　　　　　　*　　রাইবোজম।

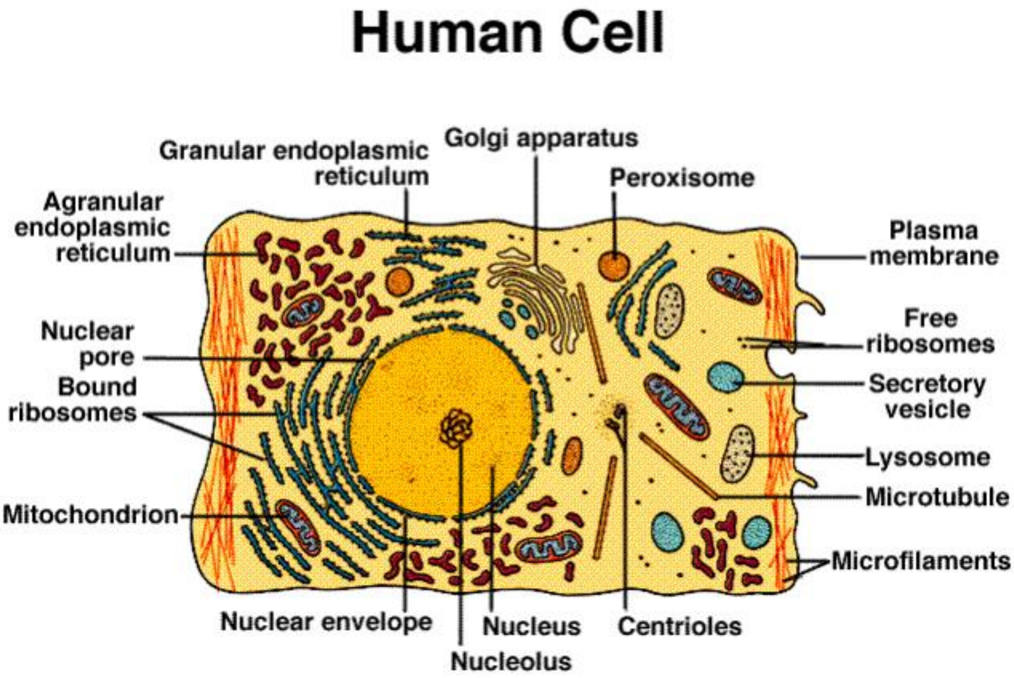

চিত্র - ১ ঃ কোষ

কোষের কার্যাবলী ঃ কোষের কয়েকটি বিশেষ কাজ রয়েছে। এগুলো হল-

১) বিপাক (Metabolism)
২) বৃদ্ধি (Growth)
৩) সচেতনতা এবং অভিযোজনতা (Irritability and adaptability)
৪) বংশ বৃদ্ধি (Reproduction)

(১) বিপাক

কোষ রক্ত থেকে পুষ্টি ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং এদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটায়। দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদান উৎপাদন করা এবং কোষের জন্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দেহ থেকে নির্গত করার প্রক্রিয়াকে বিপাক বলা হয়।

(২) বৃদ্ধি

বৃদ্ধি বলতে কোষের আকার আকৃতির বৃদ্ধিকে বুঝায়। কোষ প্রথমে অতি ক্ষুদ্র আকারে জন্মায়, পরে একটি জীবন চক্র অতিক্রম করে আকারে বৃদ্ধি পায় এবং একটি পরিপক্ক কোষে রূপান্তরিত হয়। কোষটি বিভাজিত হয়ে নতুন কোষ তৈরী করে। আয়ুকাল শেষে কোষটি অবশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং পরে মারা যায়।

(৩) সচেতনতা এবং অভিযোজনতা

কোষের সচেতনতা হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুভব করে তার সাথে অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করার ক্ষমতা এবং অভিযোজনতা হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য বহুবার বংশ বৃদ্ধি করে কোষের মধ্যে পরিবর্তন সাধন।

(৪) বংশ বৃদ্ধি

যে প্রক্রিয়ায় কোষ বিভক্তির পর একই ধরণের কোষ সৃষ্টি হয়, তাকে বংশ বৃদ্ধি বলা হয়।

পাঠ - ৩
কলা, অংগ এবং তন্ত্র

কলা (Tissue)

নির্দিষ্ট কোন শরীর বৃত্তীয় কার্য সম্পাদনের জন্য একই ধরণের অনেকগুলো জীবকোষ নির্দিষ্ট স্থান হতে উৎপত্তি লাভ করে আকারে ও গঠনে সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। একই ধরনের এই সকল কোষের সমষ্টিকে কলা (Tissue) বলে।

গঠন ও কাজের ভিত্তিতে কলা সমূহকে নিম্নলিখিত ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

১) এপিথেলিয়াল টিস্যু (Epithelial tissue) ঃ যেমন- ত্বক, মিউকাস মেমব্রেন।
২) কানেক্টিভ টিস্যু (Connective tissue) ঃ যেমন- রক্ত, অস্থি।
৩) মাসকুলার টিস্যু (Muscular tissue) ঃ যেমন- ডেলটয়েড, গ্লুটিয়াস পেশী।
৪) নারভাস টিস্যু (Nervous tissue) ঃ যেমন- মাথার মগজ, স্পাইনাল কর্ড।

১) এপিথেলিয়াল টিস্যু (Epithelial tissue)

এই টিস্যু দেহের উপরে বা ভিতরে আবরণ তৈরী করে। দেহের চর্ম, শিরা, ধমণী, ফুসফুস, যকৃত, শ্বাস নালী, পাকস্থলী প্রভৃতির ভেতরের অংশ এই টিস্যু দ্বারা গঠিত।

২) কানেক্টিভ টিস্যু (Connective tissue)

দেহের এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সাথে কিংবা একই অঙ্গের বিভিন্ন অংশের সাথে এই টিস্যু সংযোগ স্থাপন করে। কানেক্টিভ টিস্যু চর্মকে পেশীর সাথে, পেশীকে হাড়ের সাথে এবং হাড়কে অপর হাড়ের সাথে আবদ্ধ রাখে।

৩) মাসকুলার টিস্যু (Muscular tissue)

মাসকুলার টিস্যু এক বিশেষ ধরনের কলা যার সংকোচণ ও প্রসারণের ক্ষমতা আছে। অনেকগুলি সরু কোষ একত্রিত হয়ে মাসকুলার টিস্যু তৈরী করে।

৪) নারভাস টিস্যু (Nervous tissue)

মস্তিষ্ক (Brain), স্নায়ু রজ্জু ও সম্পূর্ণ দেহের স্নায়ু দ্বারা নারভাস টিস্যু গঠিত। এক ধরনের নারভাস টিস্যু মস্তিষ্ক হতে সমস্ত দেহে বার্তা পৌঁছে দেয়, এদেরকে মটর নার্ভ (Motor Nerve) বলে। আবার আর এক ধরনের নারভাস টিস্যু মস্তিকে বার্তা পৌছায় এদেরকে সেনসরি নার্ভ (Sensory Nerve) বলে।

তাছাড়া, অনৈচ্ছিক স্নায়ু আপনা থেকে প্রকৃতিগতভাবে কাজ করে। নারভাস টিস্যু নিউরন নামক এক ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেকটি স্নায়ু কোষের তিনটি অংশ রয়েছে। যথা-

ক) কোষদেহ খ) অ্যাক্সন ও গ) ডেনড্রাইট।

অংগ (Organ)

অনেকগুলো কলা একত্রিত হয়ে একটি অংগ তৈরী হয়। এগুলো কলা থেকে অধিকতর জটিল কাজ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, পাকস্থলী পরিপাক তন্ত্রের একটি অংগ। পাকস্থলী পরিপাকের জন্য বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে থাকে।

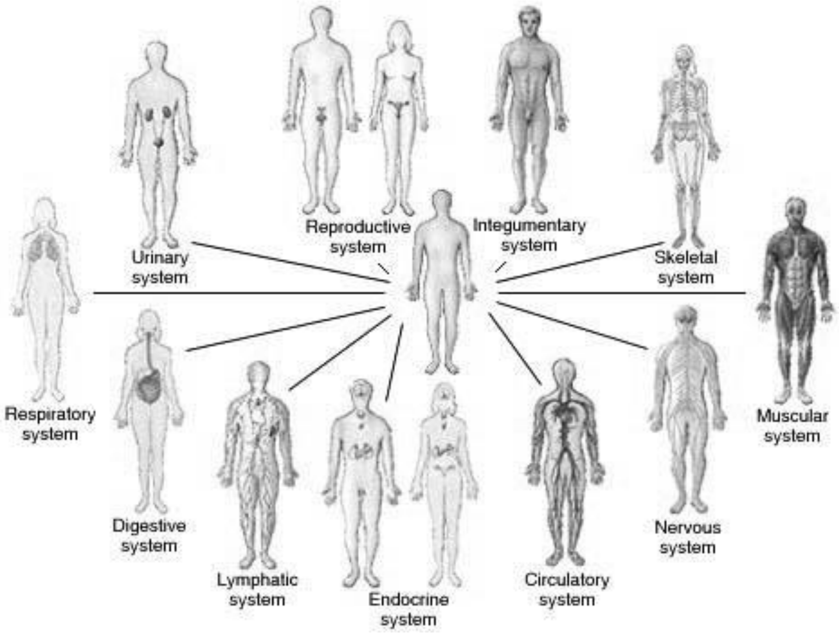

চিত্র - ২ ঃ মানব দেহের বিভিন্ন অংগ

তন্ত্র (System)

কতকগুলো বিশেষ অংগের সমষ্টিকে তন্ত্র বলা হয়। এসব অংগগুলো সম্মিলিতভাবে একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন করে। যেমন- পরিপাক তন্ত্র। এটি গলনালী (Esophagus), পাকস্থলী (Stomach) ও ইন্টেসটাইন (Intestine) ছাড়াও যকৃত (Liver) ও অগ্ন্যাশয় (Pancreas) নামক সহযোগী অংগ নিয়ে গঠিত। মানবদেহ নিম্নলিখিত তন্ত্র নিয়ে গঠিত ঃ

১। **ত্বক তন্ত্র (Integumentary system) ঃ** এই তন্ত্র প্রধানতঃ ত্বক দিয়ে গঠিত যা সম্পূর্ণ দেহকে ঢেকে রাখে এবং আঘাত ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

২। **কঙ্কাল ও পেশী তন্ত্র (Skeletal & Muscular system) ঃ** কঙ্কাল ও পেশী তন্ত্র শরীরকে নির্দিষ্ট আকার প্রদান করে এবং ভার বহণ করে। এই তন্ত্র মানুষকে চলাফেরা করতে সাহায্য

করে। বিভিন্ন আকৃতির অস্থি বা হাড় দ্বারা গঠিত শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশ মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংগকে নিরাপত্তা বিধান করে যেমন- মাথার খুলি মস্তিষ্ককে রক্ষা করে, বুকের খাঁচা হৃৎপিন্ডকে রক্ষা করে।

৩। **শ্বাস তন্ত্র (Resipiratory system) ঃ** শ্বাস তন্ত্র দেহে অক্সিজেন বয়ে নিয়ে আসে এবং দেহ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে।

৪। **রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র (Blood Circulatory system) ঃ** রক্ত সঞ্চালন তন্ত্র শরীরের বিভিন্ন অংশে বিশুদ্ধ রক্ত পাঠায় এবং সেখান থেকে দুষিত রক্ত বহন করে ফেরত আনে।

৫। **পরিপাক তন্ত্র (Digestive system) ঃ** দেহের অভ্যন্তরে খাদ্য নিয়ে আসে পরিপাক তন্ত্র। খাদ্যকে ভেঙ্গে আরও ছোট ছোট কণায় পরিণত করে। অতঃপর এই তন্ত্র খাদ্যকে শরীরের মধ্যে শুষে নেয় এবং রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে প্রেরণ করে।

৬। **মূত্র তন্ত্র (Urinary system) ঃ** মূত্র তন্ত্র শরীর থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেয়। এ তন্ত্র শরীরের পানি এবং খনিজ পদার্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৭। **প্রজনন তন্ত্র (Reproductive system) ঃ** প্রজনন তন্ত্রের মাধ্যমে জীব তার বংশ বৃদ্ধি করে থাকে।

৮। **স্নায়ু তন্ত্র (Nervous system) ঃ** স্নায়ু তন্ত্র শরীরের ভিতর এবং বাহির থেকে বার্তা পায়। এ তন্ত্র বার্তাকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করে এবং বার্তা অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৯। **অন্তঃক্ষরা তন্ত্র (Endocrine system) ঃ** এ তন্ত্র শরীরের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত কতকগুলো নালীহীন গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। গ্রন্থিগুলো কিছু হরমোন তৈরী করে যা শরীরের বিভিন্ন কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

১০। **লসিকা তন্ত্র (Lymphatic system) ঃ** এ তন্ত্র কোষ থেকে লসিকা পরিবহনের জন্য নিয়োজিত এবং ইহা লসিকা নালীর জালক ও ছোট বড় অনেক লসিকা গ্রন্থি দ্বারা গঠিত রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়ায় এটি একটি প্রধান তন্ত্র হিসাবে কাজ করে।

পাঠ - ৪
মানব দেহের বিভিন্ন অংশ এবং কতিপয় পরিভাষা

দেহের বিভিন্ন অংশের নাম

১) মস্তক বা মাথা (Head)

২) ঘাড় (Neck)

৩) কাঁধ (Shoulder)

৪) বক্ষ বা বুক (Chest)

৫) উদর বা পেট (Abdomen)

৬) পেলভিস (Pelvis)

৭) বাহু ও পা (Limbs)।

মস্তক বা মাথা (Head) ঃ মগজ (Brain) এবং অনুভূতিবাহী অংগসমূহ যেমন- চোখ, কান, নাক এবং মুখ মাথার বিভিন্ন অংশে অবস্থিত।

ঘাড় (Neck) ঃ মাথার পিছনে নীচ থেকে কাঁধের উপর পর্যন্ত অংশকে ঘাড় বলে।

বক্ষ বা বুক (Chest) ঃ ফুসফুস, হৃৎপিন্ড বুকের মধ্যে থাকে।

উদর বা পেট (Abdomen) ঃ

ক) উপর পেট ঃ পেটের এ অংশে পাকস্থলী, লিভার (যকৃত), প্যানক্রিয়াস (অগ্ন্যাশয়), কিডনী (বৃক্ক), স্প্লীন (প্লীহা), ইনটেসটাইন (অন্ত্র) ইত্যাদি অবস্থিত।

খ) তলপেট ঃ তলপেটে ইউরেথ্রা (মূত্রথলি), ওভারি (ডিম্বাশয়), ইউটেরাস (জরায়ু), ইনটেসটাইন (অন্ত্র) ইত্যাদি অবস্থিত।

বাহু ও পা (Limbs) ঃ অস্থি, মাংসপেশী, রক্ত নালী, স্নায়ু, লসিকা গ্রন্থি ইত্যাদি নিয়ে হাত ও পা গঠিত। বাহু এবং পা এর উপরিভাগে ১টি করে ও নীচের ভাগে ২টি করে লম্বা অস্থি থাকে।

শরীরের অবস্থান বর্ণনা করতে বিশেষ কতকগুলো পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। পরিভাষা গুলো হলো ঃ যেমন-

External - বহিঃস্থ, বর্হিভাগ, বাহির

Internal - অন্তঃস্থ, অভ্যন্তর, ভিতর

Anterior	-	সম্মুখাংশ, সম্মুখ, সামনে
Posterior	-	পশ্চাদাংশ, পশ্চাৎ, পেছনে
Lateral	-	পার্শ্ব, পার্শ্বদিকে
Medial	-	মধ্যবর্তী অংশ, মধ্যরেখার কাছাকাছি
Distal	-	দূরবর্তী অংশ, কেন্দ্রস্থল থেকে দূরে
Proximal	-	নিকটবর্তী অংশ, কেন্দ্রস্থল অভিমুখে
Superficial	-	উপরে বা উপরিভাগে, ভাসমান অংশ
Deep	-	ভিতরে বা গভীরে
Peripheral	-	প্রান্তীয়, দূরবর্তী

পাঠ - ৫

ত্বক তন্ত্র ও ত্বকের গঠন

ত্বকের গঠন

ত্বক দেহের বাহিরের অংশকে সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে রাখে। ত্বক দু'টি স্তরে বিভক্ত। যথা-

১) এপিডার্মিস (Epidermis)

২) ডার্মিস (Dermis)

১) এপিডার্মিস (Epidermis)

ত্বকের উপরিভাগের পাতলা আবরণকে এপিডার্মিস (Epidermis) বলা হয়। এপিডার্মিস বহু স্তরে সাজানো কোষ দ্বারা গঠিত যা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় এবং অকেজো ও শুষ্ক হয়ে স্তরে স্তরে উঠে যায়। হাত এবং পায়ের নখ এই এপিডার্মিস থেকেই তৈরী হয়। নখের গোড়ার দিকের অংশের রং দেখতে গোলাপী। কারণ, সেগুলো রক্তবাহী ধমনী বা শিরার ঠিক উপরে অবস্থান করে।

২) ডার্মিস (Dermis)

ত্বকের ভেতরের মোটা স্তরের নাম ডার্মিস । যখন ডার্মিস-এর কোষগুলো পুরানো হয়ে যায়, সেগুলো ধীরে ধীরে এপিডার্মিস-এর দিকে উঠে আসে এবং মরা কোষগুলোকে প্রতিস্থাপিত করে। অতএব, ডার্মিস সব সময় এপিডার্মিসকে কোষ সরবরাহ করে যাচ্ছে। ত্বকের সকল রক্তনালী এবং স্নায়ু এই ডার্মিসে অবস্থিত এবং লোমের/চুলের অংশ ও গ্রন্থি এই ডার্মিস-এর মধ্যে অবস্থিত। ডার্মিসে নিম্নলিখিত বস্তু অবস্থিতঃ

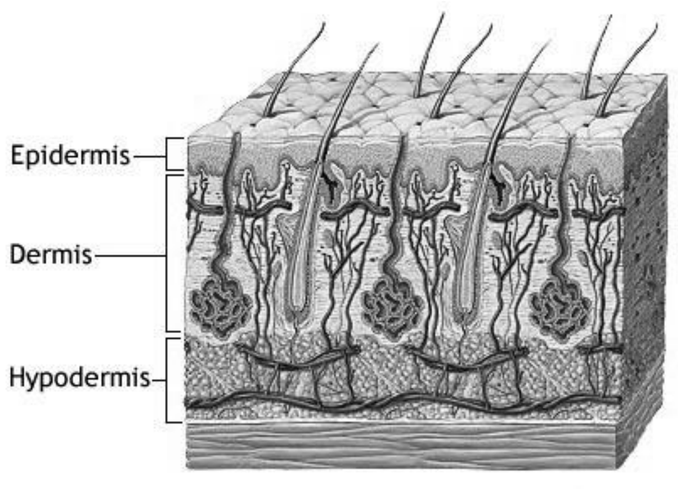

চিত্র - ৩ ঃ ত্বকের বিভিন্ন স্তর এবং ত্বকের ভিতরে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তু

ক) চুল (Hair)

ত্বকের ভেতরে অবস্থিত ক্ষুদ্র কেশ থলে বা কেশ কোষ থেকে চুল জন্মায়। যে সব রোগের জীবাণু ত্বকের ভিতর দিয়ে দেহে প্রবেশ করতে পারে না, তারা অনেক সময় এই সব কেশ কোষে আশ্রয় গ্রহণ করে। এভাবে ত্বকের সংক্রমণ শুরু হতে থাকে।

খ) তৈল গ্রন্থি (Oil Glands)

কেশ কোষ বা থলেতে এক প্রকার তৈল গ্রন্থি সংযুক্ত আছে যা ত্বককে কোমল ও আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। এই তৈল গ্রন্থি সমূহের মুখ বন্ধ হয়ে গেলে মুখ মন্ডলের ত্বকে বা দেহের উপরিভাবে লাল লাল চাকা দেখা যায়। এই লাল চাকাকে "ব্রোন" বলা হয়। তৈল গ্রন্থিগুলো সংক্রমিত হতে পারে।

গ) ঘর্ম গ্রন্থি (Sweat Glands)

ঘর্ম গ্রন্থিতে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল ত্বকের উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ঘর্ম গ্রন্থি ত্বকের উপর এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত করে দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। এই তরলকে ঘাম বা ঘর্ম বলা হয়। ঘামে পানি ও লবনের মিশ্রণ পাওয়া যায়। ইহা বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে মিশে যায় এবং শরীরে ঠান্ডার প্রভাব ফেলে।

ঘ) রক্ত নালী (Blood Vessels)

হাজার হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত নালী এই অন্তঃত্বকে দেখা যায়। এগুলো কৈশিকনালী (Capillary) নামে পরিচিত। এই সব কৈশিকনালী ত্বকে পুষ্টি সরবরাহ করে ও দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ঙ) স্নায়ু (Nerves)

ত্বকের মধ্যে সুক্ষ সুক্ষ স্নায়ু রয়েছে। এ স্নায়ু পরিবেশ সম্পর্কে বার্তা মস্তিস্কে বহন করে নিয়ে যায় স্নায়ুর প্রান্তগুলো তাপমাত্রা, স্পর্শ, চাপ, বেদনা এবং অবস্থানের পরিবর্তনের বার্তা বহন করতে পারে এবং যথাযথ প্রতিক্রিয়ার আদেশ মস্তিস্ক হতে নিয়ে আসে।

পাঠ - ৬
ত্বকের কার্যাবলী

ত্বকের কার্যাবলী

ত্বক প্রধানত ৪টি কাজ করে। যথা-

১) প্রতিরক্ষা

২) অনুভূতিতে সাড়া দেওয়া

৩) শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ

৪) দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নির্গমন।

১) **প্রতিরক্ষা ঃ** ত্বক দেহকে সব দিক থেকে ঢেকে রেখেছে। এটা দেহকে বাইরের আঘাত ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ত্বকে যে তৈল গ্রন্থি আছে তা থেকে নিঃসৃত তৈল ত্বককে মসৃন রাখে এবং বাইরের জলীয় পদার্থকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেয়। বেশীর ভাগ তরল পদার্থ ত্বকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করতে পারে না। ত্বকের তৈলাক্ত পদার্থ কমে গেলে ত্বক খস খসে হয়ে যায় এবং জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

২) **অনুভূতিতে সাড়া দেয়া ঃ** ত্বকের স্নায়ুর প্রান্তের মাধ্যমে তাপমাত্রা, স্পর্শ, চাপ, বেদনা এবং স্থানান্তর বোধ অনুভব করা যায়। ত্বকের এই স্নায়ু বিকল হয়ে গেলে কোন ব্যক্তি গরম, ঠান্ডা অথবা ব্যথা অনুভব করতে পারে না। এই অবস্থায় দেহ সহজেই আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে।

৩) **শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ ঃ** ত্বকের হাজার হাজার কৈশিকনালী দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে ত্বকের কৈশিকনালীগুলো ফুলে যায়। এতে ত্বকে রক্তসঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং অতিরিক্ত তাপমাত্রা বাইরে চলে যায়। এর ফলে ত্বক লাল বর্ণ হয় ও ত্বক গরম অনুভূত হয়। শরীরের তাপমাত্রা কমে গেলে কৈশিকনালীগুলো সংকুচিত হয়। ত্বকে রক্তসঞ্চালন কমে যায় এবং দেহের তাপমাত্রা স্থিতিশীল হয়। ত্বকের রং কিছুটা ফ্যাকাশে হয় ও শীতল বোধ হয়।

৪) **দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নির্গমন ঃ** ঘাম দেহের অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দেহ থেকে বাইরে চলে আসতে সাহায্য করে। এই ঘামে পানি, লবন ও কিছু অন্য পদার্থ থাকে।

পাঠ - ৭
অস্থি, অস্থির প্রকারভেদ ও অস্থি-মজ্জা

অস্থির সংজ্ঞা

অস্থি (Bone) এক প্রকার সংযোজন কলা (Connective Tissue)। ইহাতে ক্যালসিয়াম নামক এক প্রকার খনিজ পদার্থ থাকে। সে জন্য অস্থি এত শক্ত হয়ে থাকে।

অস্থির প্রকারভেদ

আকার অনুযায়ী অস্থিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১) **লম্বা অস্থি (Long Bone)** ঃ লম্বা অস্থি হাত এবং পায়ের উপর ও নীচের অংশে থাকে। যেমন- ফিমার (Femur), টিবিয়া (Tibia), হিউমেরাস (Humerus)। একটি লম্বা অস্থির একটি কান্ড (Shaft) এবং দু'টি গোলাকার মাথা (Epiphysis) থাকে। কান্ডের ভিতরে এক প্রকার নরম পদার্থ থাকে, যাকে অস্থি-মজ্জা (Bone Marrow) বলা হয়।

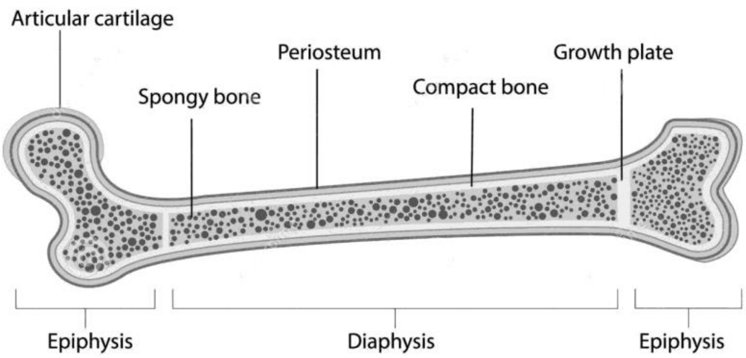

চিত্র - ৪ ঃ একটি লম্বা অস্থি

২) **খাটো বা ছোট অস্থি (Short Bone)** ঃ এ হাড়গুলো ছোট বা খাটো। খাটো বা ছোট অস্থিগুলো হাতের কবজি (Wrist) এবং পায়ের গোড়ালিতে (Ankle) অবস্থিত। যেমন- হাতের কবজির কারপাল অস্থি (carpal bones) এবং পায়ের গোড়ালির টারসাল অস্থি (tarsal bones)।

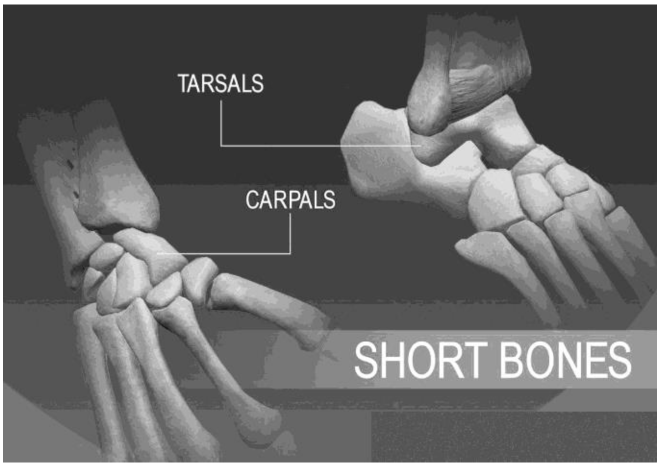

চিত্র - ৫ ঃ খাট বা ছোট অস্থি

৩) চ্যাপ্টা অস্থি (Flat Bone) ঃ এ হাড়গুলো চ্যাপ্টা ধরণের। মাথার খুলির বিভিন্ন অস্থি (Skull bones), স্ক্যাপুলা (স্কন্ধাস্থি), স্টারনাম (উরঃফলক) এবং রিব্‌স (পাঁজর) হচ্ছে চ্যাপ্টা অস্থির উদাহরণ। এই অস্থিগুলোকে আবার সমতল অস্থিও বলা হয়ে থাকে।

চিত্র - ৬ ঃ চ্যাপ্টা বা সমতল অস্থি

৪) অসম অস্থি (Irregular Bone) ঃ মেরুদন্ড এ অসম অস্থি দ্বারা গঠিত। এ অস্থিগুলোকে কশেরুকা (Vertebrae) বলে। মেরুদন্ডের এ অসম অস্থি নিম্নের কয়েকটি অংশে বিভক্ত। যেমন-

ক)	সারভাইকাল ভার্টিব্রা (Cervical Vertebrae)	-	৭টি
খ)	থোরাসিক ভার্টিব্রা (Thoracic Vertebrae)	-	১২টি
গ)	লাম্বার ভার্টিব্রা (Lumber Vertebrae)	-	৫টি
ঘ)	স্যাকরাম (Sacrum)	-	৫টি (একত্রে সংযুক্ত)
ঙ)	ককসিক্স (Coccyx)	-	৪টি (একত্রে সংযুক্ত)

মোট = ৩৩ টি ভার্টিব্রা (কশেরুকা)

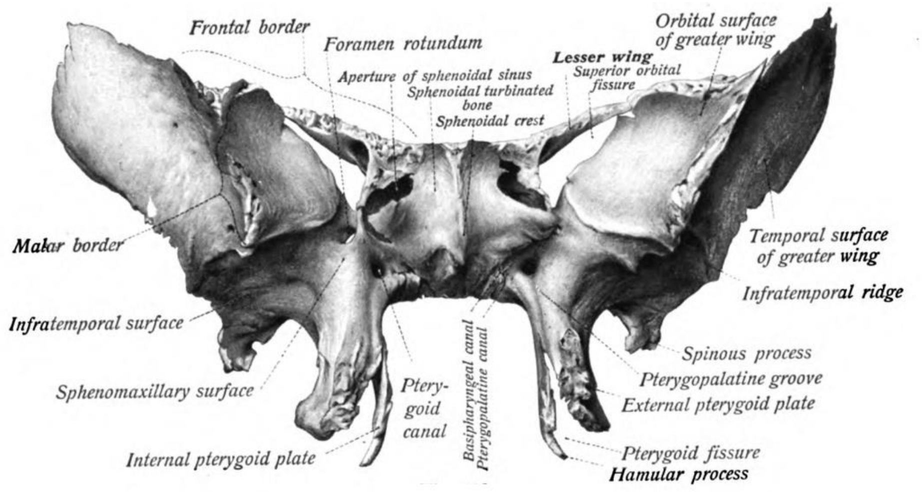

চিত্র - ৭ ঃ অসম অস্থি

অস্থি-মজ্জা (Bone Marrow)

অস্থির মধ্যে এক প্রকার নরম বস্তু থাকে যাকে বোন ম্যারো (অস্থি মজ্জা) বলে। এগুলো লোহিত রক্ত কণিকা (আরবিসি), অনুচক্রিকা (প্লেটলেট) এবং বেশীর ভাগ শ্বেত রক্ত কণিকা (ডাব্লিউবিসি) তৈরী করে এবং এ সকল কণিকাকে রক্তের ধারায় সঞ্চালিত করে। খুব ছোট শিশুদের সকল অস্থি মজ্জা থেকে রক্ত কণিকাগুলো তৈরী হয়। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কদের শুধুমাত্র স্টারনাম, রিব্স, ভার্টিব্রা, স্ক্যাপুলা, হিউমারাস এবং হিপবোন থেকে রক্ত কনিকাগুলো তৈরী হয়।

পাঠ - ৮

কঙ্কাল তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং উহার কার্যাবলী

কঙ্কাল তন্ত্র (Skeletal System)

শরীরের বিভিন্ন অস্থি একত্রে মিলে যে কাঠামো তৈরী করে, তাকেই কঙ্কাল তন্ত্র বলে। মানব দেহ ২০৬টি অস্থি দ্বারা গঠিত যা শরীরের বিভিন্ন অংশে সাজানো আছে।

কঙ্কাল তন্ত্রকে ছয়টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১) মাথার খুলি (Skull)

২) ঘাড় (Neck)

৩) উর্ধ্বাঙ্গের অস্থি (Upper Limb)

৪) নিম্নাঙ্গের অস্থি (Lower Limb)

৫) বক্ষের অস্থি (Thorax)

৬) ভার্টিব্রা ও পেলভিস (Vertebrae & Pelvis)

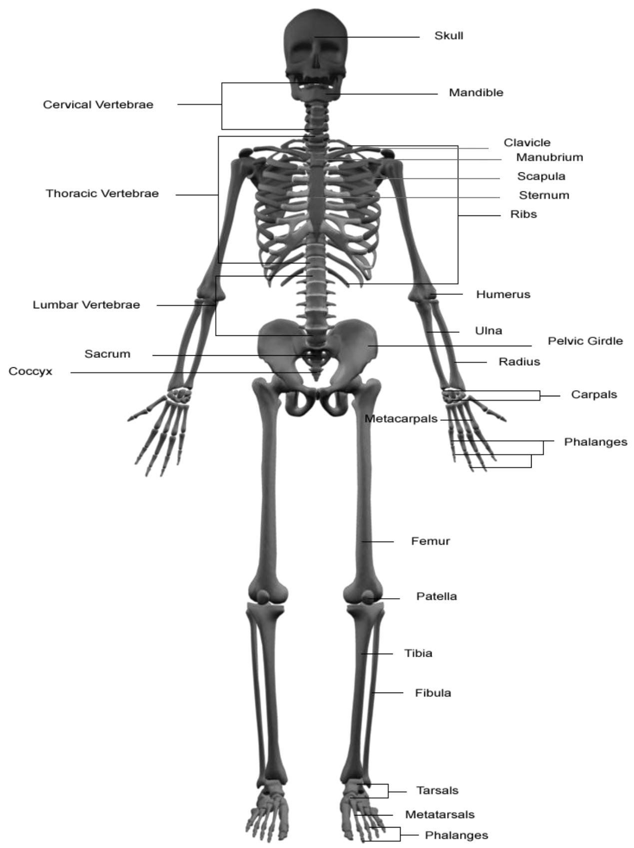

চিত্র - ৮ ঃ কঙ্কাল তন্ত্র

মাথার খুলি (Skull)

মাথার খুলি ৮টি অস্থি দ্বারা গঠিত। এ ৮টির মধ্যে কয়েকটি সমতল অস্থি যা মগজকে (Brain) রক্ষা করে। মুখমন্ডল ও চোয়াল সাতটি অস্থি দ্বারা গঠিত। মুখমন্ডলের অস্থির গঠন অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির চেহারা ভিন্নতর হয়ে থাকে।

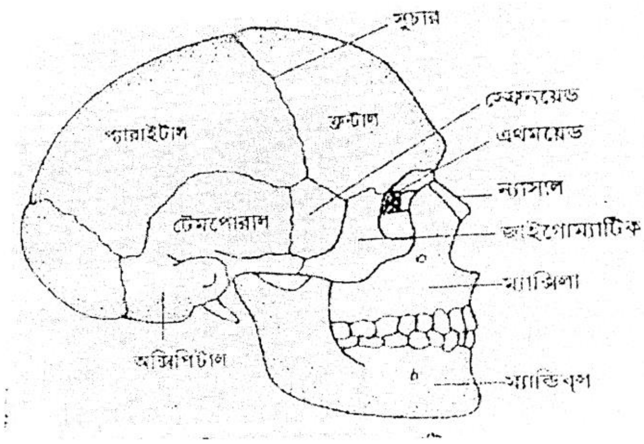

চিত্র - ৯ ঃ মাথার খুলি

মেরুদন্ড (Vertebral Column)

ছোট ছোট অসম অস্থি দ্বারা মেরুদন্ড গঠিত। এই অস্থিগুলোকে ভার্টিব্রা (Vertebrae) বলা হয়। কশেরুকাগুলো একের উপর এক করে সাজানো আছে এবং শক্ত আঁশ ও লিগামেন্ট (সন্ধি বন্ধনী) দ্বারা যুক্ত হয়ে আছে। মেরুদন্ডের স্পাইনাল কর্ড (Spinal Cord) রক্ষা করে এবং পৃষ্ঠদেশকে সোজা করে রাখে। একের উপর এক করে ভার্টিব্রা সাজানোর ফলে এদের ভিতরে একটি নলের সৃষ্টি হয়েছে। এই নলের মত পথ দিয়ে স্পাইনাল কর্ড মস্তিস্ক হতে নীচে নেমে গেছে।

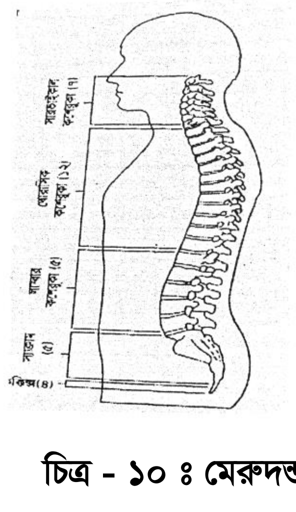

চিত্র - ১০ ঃ মেরুদন্ড

কাঁধ, বাহু এবং হাত (Shoulder, Arm, Forearm and Hand)

স্ক্যাপুলা (Scapula) এবং ক্ল্যাভিকল (Clavicle) দিয়ে কাঁধ (Shoulder) গঠিত। স্ক্যাপুলা রিব্‌স-এর (Ribs) পেছনের দিকে অবস্থিত। ক্ল্যাভিকল স্টারনাম প্রান্ত থেকে বাহিরের দিকে প্রসারিত হয়ে কাঁধের নিকট স্ক্যাপুলার সাথে মিলিত হয়।

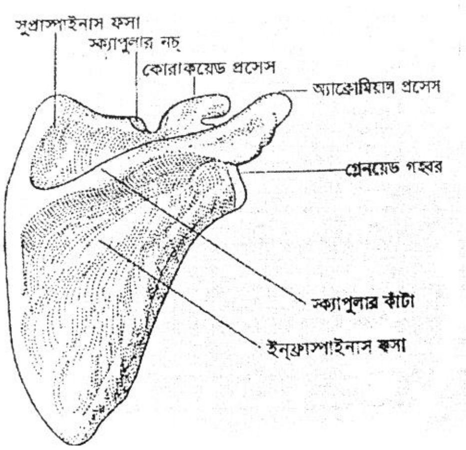

চিত্র - ১১ ঃ কাঁধের হাড়

বাহুর দু'টি অংশ আছে। উপরের বাহুতে একটি লম্বা অস্থি আছে যাকে হিইমারাস (Humerus) বলে। হিইমারাস কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত প্রসারিত। নীচের বাহুতে আছে রেডিয়াস (Radius) এবং আলনা (Ulna)। নীচের দুটি অস্থি কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত প্রসারিত। এ দু'টি অস্থি বাহুর সামনের অংশ (Forearm) গঠন করে। রেডিয়াস অস্থির নীচের প্রান্তের দিকে আমরা রেডিয়াল পালস (নাড়ীর স্পন্দন) অনুভব করি।

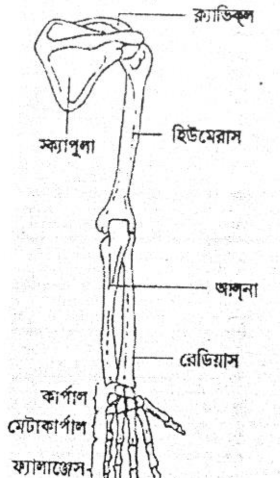

চিত্র - ১২ ঃ বাহু

কব্জি (Wrist) তে আটটি কারপাল (মনিবন্ধা) অস্থি আছে। কারপালের সাথে সাথে যুক্ত হয়ে আছে মেটাকারপাল (করতল) অস্থি যার দ্বারা হাত গঠিত হয়। মেটাকারপাল (Metacarpal) অস্থির সাথে একাধিক ফ্যালানজেস (আংগুলাস্থি) যুক্ত হয়ে আঙ্গুল (Finger) তৈরী হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলে দুটি ফ্যালানজেস (Phalanges) ও অন্যান্য আঙ্গুলে তিনটি করে ফ্যালানজেস আছে।

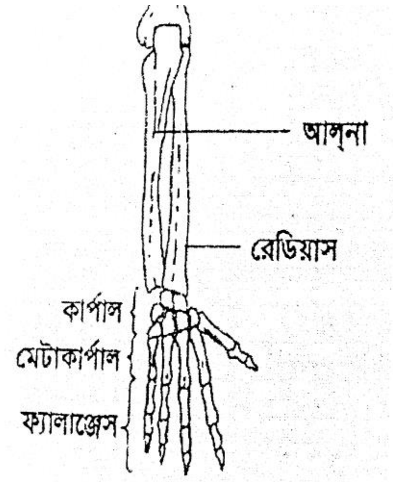

চিত্র - ১৩ ঃ কব্জি ও করতলের অস্থিসমূহ

রিব্‌স ও স্টারনাম (Ribs and Sternum)

রিব্‌স (Ribs) হচ্ছে বুকের ১২ জোড়া সরু বাঁকা অস্থি। পেছনের দিকে মেরুদন্ডের প্রত্যেক পাশে ১২টি করে রিব্‌স সংযুক্ত হয়েছে। সামনের দিকে উপরের দশটি রিব্‌স কোষ্টাল কার্টিলেজ (Costal Cartilage) এর মাধ্যমে স্টারনাম প্রত্যেক পাশে সংযুক্ত হয়েছে। নীচের দুটি রিব্‌স সামনের দিকে উভয় পার্শ্বে ভাসমান অবস্থায় থাকে।

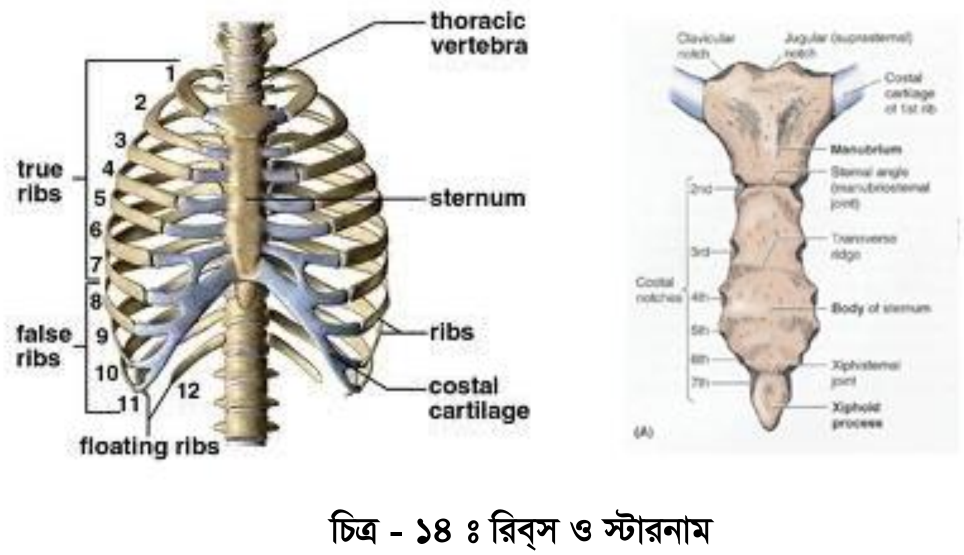

চিত্র - ১৪ ঃ রিব্‌স ও স্টারনাম

পেলভিস, পা এবং পায়ের পাতা (Pelvis, Leg and Foot)

পেলভিস (Pelvis) হচ্ছে শরীরের নীচের অংশে অস্থির তৈরী একটি বৃত্তাকার বিশেষ যা মেরুদন্ডের ভার বহন করে এবং পায়ের উপর ভর দিয়ে থাকে। পেছনের দিকে দুটি হিপ বোন (Hip Bone) স্যাক্রামের (Sacrum) সাথে মিলিত হয়ে এবং সামনের দিকে সিমফাইসিস পিউবিস (Symphysis Pubis) এ মিলিত হয়ে পেলভিস (Pelvis) গঠিত হয়েছে।

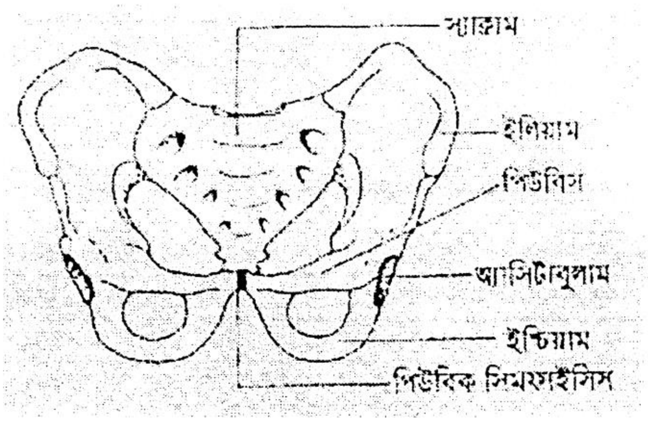

চিত্র - ১৫ ঃ পেলভিসের হাড়

পায়ের তিনটি অংশ আছে। উপরের অংশে উরু (Thigh) একটি লম্বা অস্থি দ্বারা গঠিত যাকে ফিমার (Femur) বলে। উর্ধাস্থি বা ফিমার পেলভিস অস্থি থেকে হাটু পর্যন্ত বিস্তৃত। পায়ের নীচের অংশে দুটি হাড় টিবিয়া (Tibia) এবং ফিবুলা (Fibula) রয়েছে। উপরের প্রান্তে টিবিয়া হাটু জয়েন্ট (Knee Joint) কিছুটা অংশ তৈরী করে। নীচের প্রান্তে টিবিয়া ও ফিবুলা উভয়েই গোড়ালি (Ankle) পর্যন্ত প্রসারিত এবং এখানে টারসাল অস্থির (Tarsal Bones) সাথে মিলিত হয়ে অ্যাংকেল জয়েন্ট (Ankle Joint) তৈরী হয়।

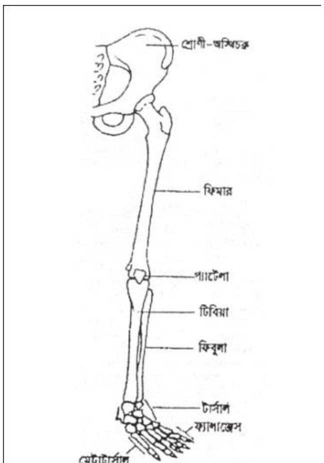

চিত্র - ১৬ ঃ পায়ের হাড়

প্যাটেলা

প্যাটেলা (Patella) হচ্ছে হাটু সন্ধির সামনের অংশ গঠনকারী একটি ছোট অস্থি। ইহা হাটু সন্ধিকে রক্ষা করে। সাতটি টারসাল (Tarsal bones) মিলে গোড়ালি (Ankle) গঠিত হয়েছে। টারসাল অস্থির সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে মেটাটারসাল অস্থি (Metatarsal bones), যার দ্বারা পায়ের পাতা তৈরী হয়েছে। দুটি ফ্যালানজেস (Phalanges) দিয়ে পায়ের বৃদ্ধাংগুলি গঠিত হয়েছে। পায়ের বাকী চারটি আংগুল তিনটি করে ফ্যালানজেস (Phalanges) দিয়ে গঠিত হয়েছে।

চিত্র - ১৭ ঃ পায়ের পাতার হাড়

কঙ্কাল তন্ত্রের কার্যাবলী ঃ কঙ্কাল তন্ত্রের প্রধান ৫টি কাজ হলো-

১) **শরীরের ভার বহন করা-** কঙ্কাল তন্ত্র শরীরকে খাড়া রাখে এবং শরীরের গঠন ঠিক রাখে।

২) **সচলতা-** অস্থির গায়ে মাংসপেশী সংযুক্ত থাকে। এ মাংসপেশী সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে শরীরকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে।

৩) **নিরাপদ রাখা-** কঙ্কাল তন্ত্র দেহের গুরুত্বপূর্ণ অংগগুলোকে নিরাপদে রাখে। যেমন- মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড এবং ফুসফুস।

৪) **সংরক্ষণ-** অস্থিসমূহ খনিজ দ্রব্য সংরক্ষণ করে এবং প্রয়োজনের সময় খনিজ পদার্থ রক্তের মধ্যে মিশিয়ে দেয়।

৫) **কোষ তৈরী-** কিছু কিছু অস্থির অস্থি মজ্জা থেকে লোহিত কণিকা, অনুচক্রিকা এবং শ্বেত কণিকা তৈরী হয়।

পাঠ - ৯
সন্ধি, সন্ধির প্রকারভেদ ও সন্ধির নড়াচড়া

সন্ধি (Joint)

সন্ধি হচ্ছে সেই স্থান যেখানে দুই বা ততোধিক অস্থি একত্রে মিলিত হয়েছে। সন্ধির স্থানে অস্থিগুলো ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী আঁশ জাতীয় এক প্রকার যোজন কলা, যাকে বন্ধনী বা লিগামেন্ট (Ligament) বলা হয়। এ বন্ধনী বা লিগামেন্ট দ্বারা অস্থি একে অন্যের সাথে সংযুক্ত থাকে।

সন্ধির প্রকারভেদ ঃ সন্ধিকে নড়াচড়া (Movement) অনুযায়ী নিম্নের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক) **সচল সন্ধি ঃ** এ ধরনের সন্ধি নড়াচড়া করতে সক্ষম। যেমন- কনুই, হাটু, হাত ও পায়ের আংগুলের সন্ধি। সচল সন্ধিগুলোতে সাধারণতঃ লিগামেন্টের বাইরে একটি পর্দার আস্তরণ থাকে যাকে সাইনোভিয়াল মেমব্রেন বা সন্ধি ঝিল্লি (Synovial Membrane) বলা হয়। এ ঝিল্লি থেকে এক প্রকার তরল বের হয়, যা সন্ধিগুলোকে স্বচ্ছন্দভাবে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে। একটি সন্ধি যত সচল হবে তার আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশী। সচল সন্ধিগুলোর নড়াচড়া পরিধি খুব বেশী থাকে এবং ইহার আঘাত পাওয়া, রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুকিও সবচেয়ে বেশি।

চিত্র - ১৮ ঃ সচল সন্ধি

খ) **আংশিক সচল সন্ধি ঃ** আংশিক সচল সন্ধি নিয়ন্ত্রিতভাবে নড়াচড়া করতে পারে। দুটি অস্থির মধ্যবর্তী স্থানে তরুনাস্থি দ্বারা পূর্ণ থাকে। পেলভিসের অস্থিসমূহের সন্ধি এবং মেরুদন্ডসমূহের অস্থির সন্ধিগুলো হলো আংশিক সচল সন্ধির উদাহরণ। মেরুদন্ডের রিব্‌স এবং স্টারনামের সন্ধিগুলোও আংশিক সচল উদাহরণ। এ সন্ধিগুলো শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় কিছুটা নড়াচড়া করে।

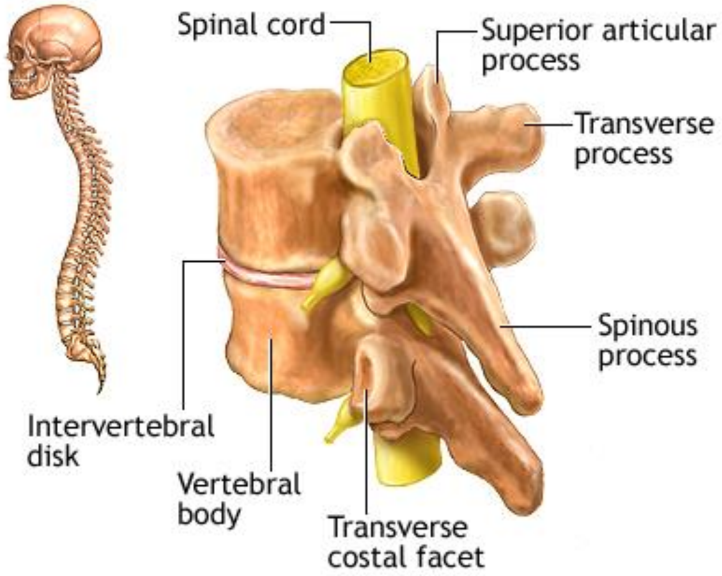

চিত্র - ১৯ ঃ আংশিক সচল সন্ধি

গ) **অচল সন্ধি ঃ** যে সন্ধিগুলো মাথার খুলিকে একত্রে ধরে রাখে, সেগুলো মোটেই নড়াচড়া করে না। এ সন্ধিগুলো সচল অথবা আংশিক সচল সন্ধি অপেক্ষা শক্তিশালী। যে লাইনে মাথার খুলির অস্থিগুলো মিলিত হয় তাকে সুচার (Suture) বলে। অবস্থান অনুযায়ী সুচার (Suture) কে নামকরণ করা যায়। নিম্নে বিভিন্ন ধরণের সুচার (Suture) এর নাম উল্লেখ করা হলো এবং ছবিতে এদের অবস্থান দেখানো হলোঃ

- ফ্রন্টাল সুচার (Frontal Suture)
- স্যাজিটাল সুচার (Sagital Suture)
- করোনাল সুচার (Coronal Suture)
- টেম্পোরাল সুচার (Temporal Suture)
- ল্যামবয়ডাল সুচার (Lamboidal Suture)

মাথার তালু বা চাঁদি (Fontanelle)

ছোট শিশুদের মাথার খুলির অস্থিগুলো খুব শক্ত ভাবে জোড়া লাগানো থাকে না। জন্মের পর উল্লেখিত সুচারগুলো ধীরে ধীরে শক্ত হয়। ছোট শিশুদের মাথার খুলির অস্থিগুলো যে সকল সরু সন্ধি দ্বারা জোড়া লাগানো থাকে তাকে মাথার তালু বা চাঁদি (Fontanelle) বলে। ফ্রন্টাল সুচার এবং স্যাজিটাল সুচার যেখানে মিলিত হয় সেখানে এক প্রকার পাতলা পর্দা থাকে একে Anterior Fontanelle বলে। আর স্যাজিটাল সুচার এবং ল্যামবয়ডাল সুচার এর মিলিত বা সংযোগ স্থানকে Posterior Fontanelle বলে। এ সন্ধি ও এক প্রকার পাতলা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। এই নরম তালু বা চাঁদির জন্য শিশুর মাথার খুলির অস্থিগুলো কিছুটা নড়াচড়া করতে পারে। অস্থির এ নড়াচড়ার ফলেই শিশুর মাথা প্রসবের সময় প্রসবের সরু পথ সহজভাবে অতিক্রম করতে পারে। এ নড়াচড়ার ফলেই মস্তিষ্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথার খুলিরও বিস্তৃতি হয়। তালু বা চাঁদিগুলো জীবনের প্রথম কয়েক মাস নরম থাকে। পরে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। পেছনের চাঁদিটি ২ থেকে ৮ মাসের মধ্যে এবং সামনের চাঁদিটি প্রায় ৯ মাস থেকে ১৮ মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। ছোট শিশুদের চাঁদি দেখে অসুখের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ বুঝা যায়। যেমন- ডায়রিয়া জনিত পানি স্বল্পতায় (Dehydration) চাঁদি ডেবে যায়, আর মস্তিস্কের পর্দার প্রদাহে (Meningitis) ইন্ট্রাক্রেনিয়াল প্রেসার (Intracranial Pressure) বৃদ্ধি পায় যার ফলে মাথার চাঁদি স্ফীত হয়।

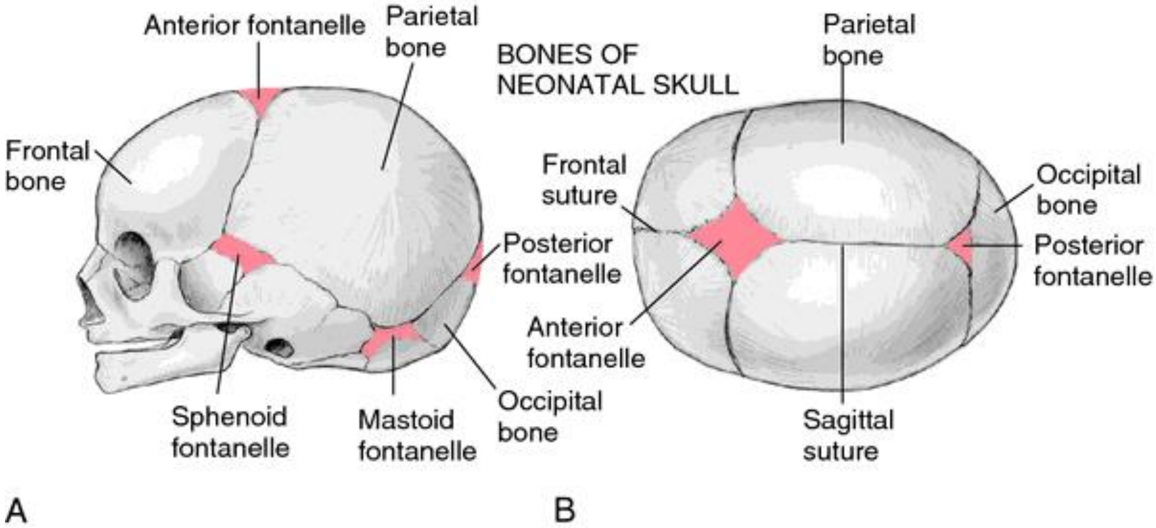

চিত্র - ২০ ঃ অচল সন্ধিসমূহ

সন্ধির নড়াচড়া (Movement)

সন্ধির নড়াচড়া বর্ণনা করার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ পরিভাষাগুলো ব্যবহার করা হয়। যেমন-

ভাঁজ করা (Flexion)	- বাঁকানো এবং খাট করা
প্রসারিত করা (Extension)	- সোজা করা এবং লম্বা করা
বর্হিনায়ন (Abduction)	- শরীরের কোন অংশ শরীর থেকে বাহিরের দিকে নিয়ে যাওয়া
প্রত্যায়ন (Adduction)	- শরীরের কোন অংশ বাহির থেকে শরীরের দিকে নিয়ে আসা
চক্রাকারে ঘোরা (Rotation)	- বৃত্তের আকারে ঘোরানো
চতুরদিকে ঘোরা (Circumduction)	- শরীরের চর্তুদিকে নির্দিষ্ট সার্কেলে ঘোরানো।

পাঠ - ১০
পেশী, পেশীর প্রকারভেদ এবং কার্যাবলী

পেশী (Muscle)

পেশী এক ধরনের কলা যা পেশী কোষ বা আঁশ দ্বারা গঠিত। পেশীর আঁশ গোছা আকারে সাজানো থাকে এবং যোজন কলা দ্বারা একে অপরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এপেশী কোন অংগ বা শরীরের কোন অংশকে মুভমেন্ট (Movement) করতে পারে।

পেশীর প্রকারভেদ ঃ গঠনগত ভাবে পেশী তিন ধরণের। যথা-

১। মসৃণ পেশী (Smooth Muscle)

মসৃণ পেশী শরীরের অনেক অংগের দেয়াল তৈরী করে। যেমন- পাকস্থলী এবং অন্ত্রনালী। মসুণ পেশীকে অনৈচ্ছিক পেশী বলা হয়। কারণ, এসব মাংসপেশী ইচ্ছানুযায়ী চালনা করা যায় না। তারা আপনা-আপনি সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পাকস্থলী খাদ্যে পরিপূর্ণ হলে মসৃণ মাংসপেশীগুলো নড়াচড়া শুরু করে, খাদ্যকে পাচক রসের সংগে মিশ্রিত হতে সহায়তা করে এবং খাদ্যকে নীচের দিকে চালনা করে। এ প্রক্রিয়াকে পেরিষ্টালটিক মুভমেন্ট (Peristaltic Movement) বলে। প্রসবের সময় জরায়ুর পেশীও সক্রিয় ভাবে কাজ করে।

২। হৃদপিন্ডের পেশী (Heart Muscle)

৩। অস্থির পেশী (Skeletal Muscle)

অস্থির পেশী, পেশী কলার গোছার সমন্বয়ে গঠিত। পেশীর উভয় প্রান্তের গোছাগুলো মিলিত হয়ে শক্ত দড়ির মত তৈরী করে, যাকে টেন্ডন (পেশীবন্ধনী) বলা হয়। অস্থির টেন্ডন (Tendon) দ্বারা অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। প্রতিটি পেশীর গোছার মধ্যে স্নায়ু থাকে এবং এ স্নায়ুর মাধ্যমে দেয়া বার্তা অনুযায়ী মাংসপেশী চালিত হয়।

অস্থি এবং সন্ধি নিজে নিজে সচল হয় না। এগুলো অস্থির পেশীর উপর নির্ভর করে। অস্থির পেশীকে ঐচ্ছিক পেশী বলা হয়। কারণ, প্রাণীকুল এগুলোর কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। অস্থির পেশী হাত, পা, মেরুদন্ড এবং মাথার নড়াচড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

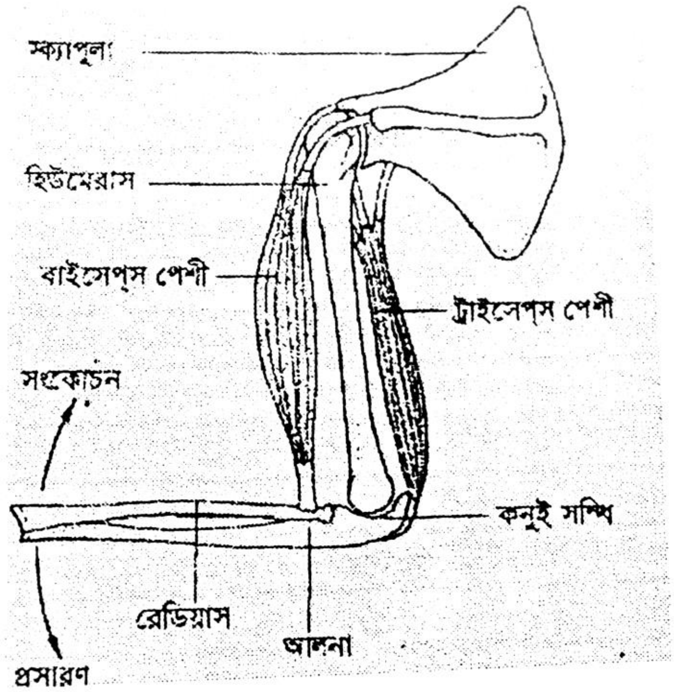

চিত্র - ২১ ঃ অস্থির পেশী

পেশীর কার্যাবলী

পেশীর কাজ হচ্ছে শরীরের কোন অংগ বা অংশ চালনা করা। কোন অংগ তখনই সচল হয় যখন পেশীসমূহ একত্রে সংকুচিত ও ছোট হয়। এ ছোট হওয়াকে সংকোচন (Contraction) বলা হয়। সংকোচনের বিপরীত হচ্ছে শিথিল হওয়া (Relaxation)। হাঁটা, খাওয়া, কোন কিছু উঠানো বা বসা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজের জন্য পেশীর বিভিন্ন রকম ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। কিছু পেশী যখন সংকোচিত হতে থাকে তখন অন্য কিছু পেশী আবার শিথিল হতে থাকে। অন্যান্য পেশী শরীরের কিছু অংশকে শক্তভাবে ধরে রাখে যাতে শরীর স্থানচ্যুত না হয। শরীরকে নড়াচড়া করাতে হলে, পেশী অবশ্যই অস্থির দু'প্রান্তে যুক্ত থাকতে হবে। পেশী যে অস্থিতে সংযুক্ত থাকবে তা অবশ্যই শক্তিশালী এবং নিরোগ হতে হবে। পেশীর স্নায়ুগুলো অবশ্যই স্বাভাবিক অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায় থাকতে হবে, যাতে সেগুলো সঠিক বার্তা গ্রহণ করতে পারে। যখন স্নায়ুগুলো ভালভাবে কাজ করে এবং পেশীগুলো সুস্থ থাকে তখন পেশীগুলো খুব শক্তিশালী এবং দৃঢ় হয়। যখন স্নায়ুগুলো ভালভাবে কাজ করে না এবং পেশীগুলো সুস্থ থাকে না, তখন পেশীর শক্তি বা দৃঢ়তা কমে যায়। যখন স্নায়ুগুলো কোন কাজ করে না, তখন পেশী অবশ (Paralysis) হয়ে যায়, পেশীর কোন শক্তি বা দৃঢ়তা থাকে না। অবশ পেশী বৃদ্ধি লাভ করতে পারে না অর্থাৎ বাড়ে না এবং ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে।

পাঠ - ১১

যে সব পেশীতে ইনজেকশন দেয়া হয় তার পরিচিতি

যে সব পেশীতে ইনজেকশন দেয়া হয় তার নাম

রোগীর শরীর ওষুধ প্রয়োগের জন্য অনেক সময় পেশীতে ইনজেকশন (Intramuscular Injection) I/M দেয়ার জন্য শরীরের বড় বড় পেশীগুলো ব্যবহার করা হয়। ইনজেকশন দেয়ার জন্য সাধারণতঃ সে সব পেশী ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে ঃ

১) ত্রিকোন পেশী (Deltoid Muscle)

২) নিতম্ব পেশী (Gluteus Maximus Muscle) এবং

৩) উরুর পেশী (Rectus Femoris Muscle)

১) **ত্রিকোন পেশী (Deltoid Muscle) ঃ** এ পেশী হাত এবং কাঁধের সন্ধির উপরের এবং বাহিরের দিকে অবস্থিত। ইনজেকশনের স্থান হচ্ছে উপরের এবং বাহিরের চতুর্থাংশ যা ছবিতে দেখানো হয়েছে। যদি অন্য কোন অংশ ইনজেকশনের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে স্নায়ু এবং রক্তনালী ক্ষতি (Injury) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

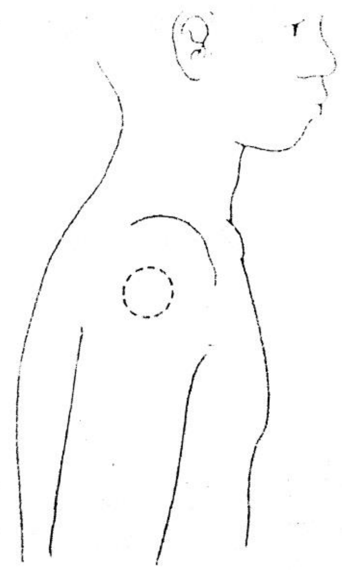

চিত্র - ২২ ঃ বাহুতে ইনজেকশন দেয়ার স্থান

২) **নিতম্ব পেশী (Gluteus Maximus Muscle) ঃ** ইহা নিতম্বের মাংসল মোটা অংশ তৈরী করে। হাতের Deltoid Muscle এর মতই ইনজেকশন দেয়ার স্থান হচ্ছে নিতম্বের উপরের এবং বাহিরের চতুর্থাংশ।

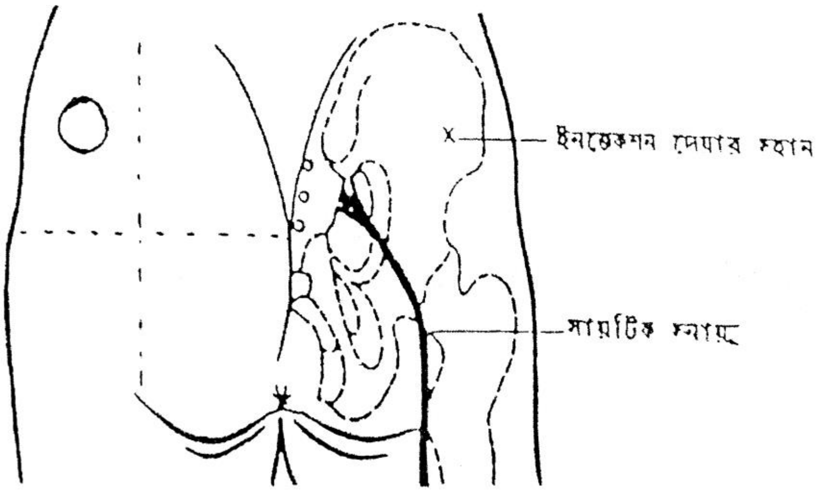

চিত্র - ২৩ ঃ নিতম্বে ইনজেকশন দেয়ার স্থান

৩) **উরুর পেশী (Rectus Femoris Muscle) ঃ** উরুর সামনের চারটি পেশীর মধ্যে এটি একটি। এই স্থানটি সাধারণতঃ শিশুদের ইনজেকশন দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ উপরে উল্লেখিত দু'টি স্থান থেকে এস্থানটি বেশ মাংসল। উরুর (Thigh) নীচের দুই তৃতীয়াংশ এবং উপরের এক তৃতীয়াংশ এর সংযোগ স্থলে একটু বাহিরের দিকে ইনজেকশন দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

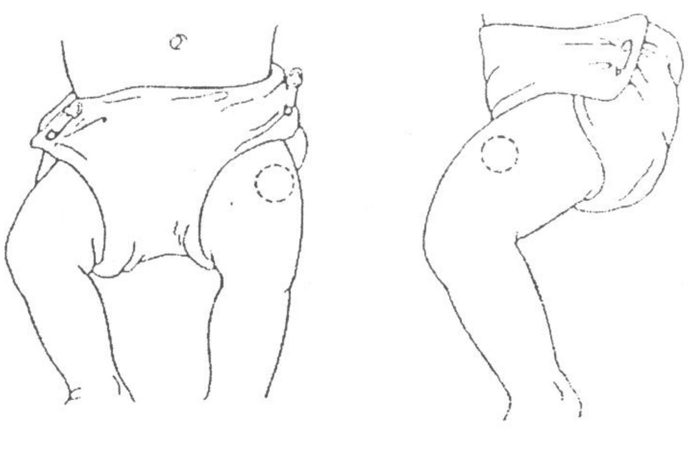

চিত্র - ২৪ ঃ উরুতে ইনজেকশন দেয়ার স্থান

পাঠ - ১২
রক্তসংবহন তন্ত্রের গঠন

রক্তসংবহন তন্ত্রের (Blood Circulatory System) গঠন ঃ

রক্ত সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিন্ড থেকে কলার (Tissue) দিকে যায় এবং কলা থেকে আবার হৃৎপিন্ডে ফেরত আসে। রক্ত সংবহন তন্ত্রের মধ্যে রয়েছে-

১) হৃদপিন্ড

২) ধমনী

৩) শিরা এবং

৪) কৈশিকনালী

১) হৃৎপিন্ড (Heart) ঃ হৃৎপিন্ড পেশী দিয়ে তৈরী একটি পাম্প যন্ত্র। হৃৎপিন্ডের পেশী রক্তকে পাম্প করে শরীরের মধ্যে চালনা করে। হৃৎপিন্ড বুকের মধ্যে দুই ফুসফুসের মাঝখানে অবস্থিত এবং স্টারনামের পিছনে কিন্তু কিছুটা বাম দিকে অবস্থিত। হৃৎপিন্ডের নীচের অংশ বুকের বাম পার্শ্বে তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম রিব্‌স (Ribs) পর্যন্ত বিস্তৃত। হৃৎপিন্ডের শীর্ষকোন (Apex) পঞ্চম ও ষষ্ঠ পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানে ও স্তনবৃন্তের সামান্য নীচে অবস্থিত।

সমগ্র হৃৎপিন্ডটি একটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট পেরিকার্ডিয়াম নামক পাতলা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত। হৃৎপিন্ড হৃদপেশী (Heart Muscle) দ্বারা গঠিত। হৃৎপিন্ড চারটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। উপরের দুটি প্রকেষ্ঠ হল পাতলা প্রাচীর যুক্ত ডান এবং বাম অলিন্দ (Atrium) এবং নীচের দুটি হল পুরু প্রাচীরযুক্ত ডান এবং বাম নিলয় (Ventricle)। দু'টি অলিন্দ এবং দুটি নিলয় যথাক্রমে ইন্টারঅ্যাট্রিয়াল এবং ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম নামক দেয়াল দ্বারা পরস্পর হতে পৃথক থাকে। অলিন্দ থেকে নিলয়ের প্রবেশদ্বারে কপাটিকা (Valve) যুক্ত থাকে। ডানে তিনটি কপাটিকা যুক্ত (ট্রাইকাসপিড) এবং বামে দুটি কপাটিকা (বাইকাসপিড) থাকে। ডান নিলয় হতে উদ্ভুত পালমোনারী ধমনীর ছিদ্রপথে এবং বাম নিলয় হতে উদ্ভুত মহাধমনীর মুখের কপাটিকা দুটি অর্ধচন্দ্রকার (Semilunar)। এ কপাটিকা বা ভাল্ব রক্তকে শুধুমাত্র একদিকে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে এবং পিছন দিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। হৃৎপিন্ডের প্রাচীর তিনটি পৃথক স্তরে গঠিত। যথা- বাহিরে পেরিকার্ডিয়াম (Pericardium), মাঝখানে মায়োকার্ডিয়াম (Myocardium) এবং ভিতরে এন্ডোকার্ডিয়াম (Endocardium)।

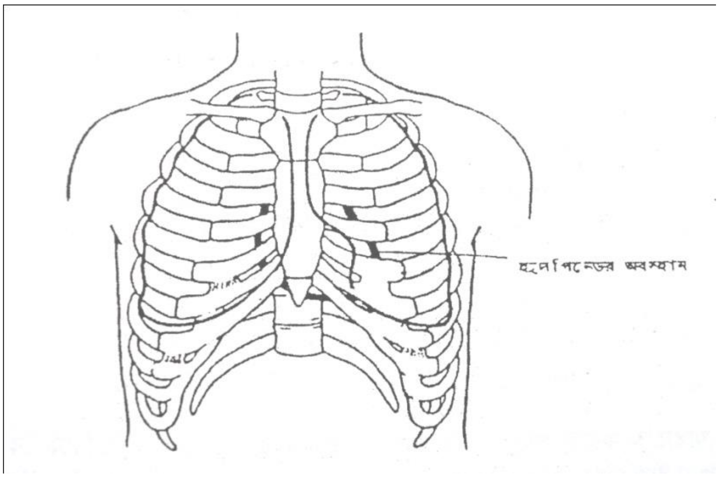

চিত্র - ২৫ ঃ হৃৎপিন্ডের অবস্থান

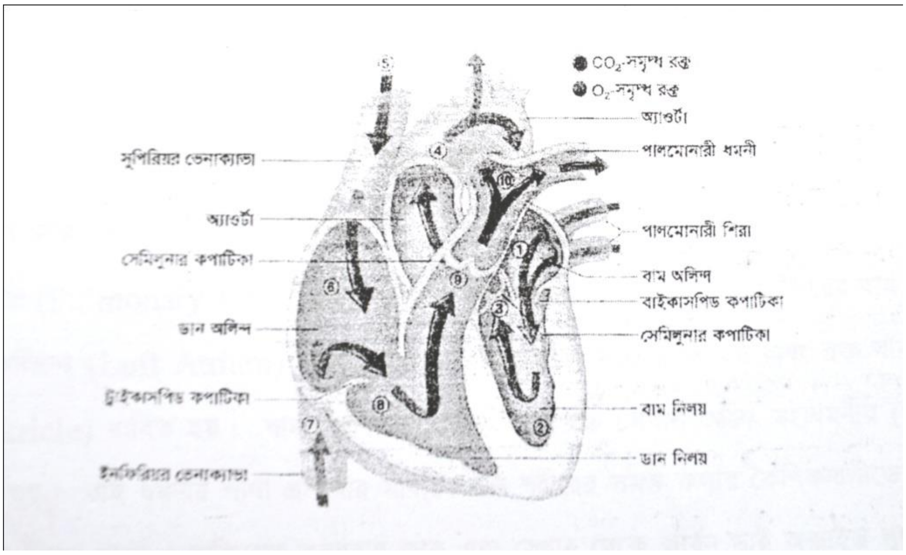

চিত্র - ২৬ ঃ রক্তসংবহন তন্ত্র (হৃৎপিন্ডের লম্বচ্ছেদ-রক্তের গতি নির্দেশক)

রক্ত নালীর মধ্যে দিয়ে রক্ত চলাচল করে। রক্ত নালী তিন ধরণের হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে-
ধমনী (Artery), শিরা (Vein) এবং কৈশিকনালী (Capillary)।

২) ধমনী (Artery) ঃ ধমনী হৃৎপিন্ড থেকে রক্ত বয়ে দুরে নিয়ে যায়। ধমনীর ভিতরের চাপ বেশী। ধমনীর দেয়ালগুলো পুরু এবং মাংসল যাতে উচ্চ চাপ প্রতিরোধ করতে পারে। একটি ধমনী কেটে গেলে প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের সাথে সাথে সবেগে বা ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়। ধমনীর রক্তে অক্সিজেন অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। ধমনী বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে।

৩) শিরা (Vein) ঃ শিরা শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত হৃৎপিন্ডে বয়ে নিয়ে আসে। শিরাগুলো পাতলা দেয়াল বিশিষ্ট রক্ত নালী। শিরার ভিতরে চাপ খুব কম। তাই শিরা কেটে গেলে আস্তে আস্তে রক্ত বের হয়। শিরার রক্তে কার্বন ডাই অক্সাইড অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। শিরা দূষিত রক্ত বহন করে।

৪) কৈশিকনালী (Capillary) ঃ কৈশিকনালী হচ্ছে খুব সরু রক্ত নালী যেগুলো ধমনী ও শিরাকে সংযুক্ত করে। এগুলো খুব পাতলা দেয়াল বিশিষ্ট এবং ভিতরের চাপ খুব কম। কৈশিকনালীর দেয়ালগুলো রক্ত এবং শরীরের অন্যান্য অংশের মধ্যে প্রতিবন্ধক (Barrier) হিসাবে থাকে। লোহিত কণিকা (Red Blood Cell), রক্তের আমিষ (Plasma Protein), রক্তরস (Serum) ইত্যাদি কৈশিকনালীতে অবস্থান করে। পানি, অক্সিজেন, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পুষ্টিকর পদার্থ এই দেয়ালের মধ্যে দিয়ে সহজেই যাতয়াত করতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের এই আমিষ পানিকে কৈশিকনালীর মধ্যে ধরে রাখে। যখন এই কৈশিকনালী আঘাতপ্রাপ্ত হয় অথবা রক্তে আমিষ কমে যায় তখন পানি কৈশিকনালী থেকে নির্গত হয়ে বাহিরে কলা বা টিস্যুতে চলে আসে। এভাবে কলাতে পানি জমে উঠার ফলে শরীরে শোথের (Oedema) সৃষ্টি হয়।

পাঠ - ১৩
হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন, নাড়ী এবং রক্তচাপ

ভূমিকা

মানুষের বেচে থাকার জন্য হৃৎপিন্ড, ফুসফুস এবং মগজের স্বাভাবিক কার্যকারিতা থাকতে হবে। প্রধান এ তিনটি অঙ্গের যে কোন একটির কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কিছুক্ষনের মধ্যেই (৪-১০ মিনিট) মানুষ মারা যাবে। সে জন্য এ তিনটি অঙ্গকে ভাইটাল অর্গান (Vital organ) বলা হয়। হৃৎপিন্ড কাজ করে রক্তসংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে, ফুসফুস কাজ করে শ্বাস তন্ত্রের মাধ্যমে এবং মগজ কাজ করে স্নায়ু তন্ত্রের মাধ্যমে।

হৃৎপিন্ডের মাধ্যমে রক্তের সংবহন

কৈশিক নালী (Capillary) রক্ত কোষ এবং কলা (Tissue) থেকে অপ্রয়োজনীয় কার্বন ডাই অক্সাইড বয়ে নিয়ে আসে এবং শিরার মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিন্ডে ফেরত আসে। কার্বন ডাই অক্সাইড পরিপূর্ণ রক্ত হৃৎপিন্ডের উপরের ডান প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ডান অলিন্দে (Right Atrium) প্রবেশ করে। ডান অলিন্দ সংকোচিত হলে রক্ত নীচের ডান প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ডান নিলয়ে (Right Ventricle) প্রবেশ করে। ডান নিলয়ের সংকোচনের ফলে রক্ত পালমোনারী ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসের কৈশিকনালীগুলোতে প্রবেশ করে। রক্ত ফুসফুসে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে এবং অক্সিজেন গ্রহণ করে।

ফুসফুসীয় শিরা (Pulmonary Vein) ফুসফুস থেকে অক্সিজেন পূর্ণ রক্ত হৃদপিন্ডের উপরের বাম প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ বাম অলিন্দে (Left Atrium) নিয়ে আসে। বাম অলিন্দ সংকোচিত হয় এবং রক্ত বাম নিলয়ে (Left Ventricle) ধাবিত হয়। বাম নিলয় সংকোচিত হলে রক্ত সেখান থেকে মহাধমনীর (Aorta) দিকে ধাবিত হয়। এই ধমনীর শাখা প্রশাখার মাধ্যমে রক্ত শরীরের সমস্ত কলার কৈশিকনালীতে পৌঁছে। এই রক্ত কলাগুলোতে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড পুনঃ দুষিত রক্ত আবার হৃৎপিন্ডে ফেরত নিয়ে আসে।

এভাবে শরীরের সমস্ত কলা থেকে রক্ত হৃৎপিন্ডের ডান পার্শ্বে ফেরত যায় এবং এই রক্তের সবটাই ফুসফুসে পাঠানো হয়। সেখানে সে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে। তাপর হৃৎপিন্ডের বাম অংশ থেকে পাম্প হয়ে শরীরের কলাগুলোতে প্রবেশ করে। হৃৎপিন্ডের ডান পাশ থেকে ফুসফুস হয়ে বাম পাশে রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে ফুসফুসীয় সংবহন (Pulmonary Circulation) বলা হয়। হৃৎপিন্ডের বাম পাশ থেকে শরীরের বিভিন্ন কলা হয়ে হৃৎপিন্ডের ডান পাশে রক্ত প্রবাহিত হওয়াকে তন্ত্রীয় সংবহন (Systemic Circulaltion) বলা হয়।

পাল্‌স (Pulse)

তন্ত্রীয় সংবহনের রক্ত যখন হৃৎপিন্ড ত্যাগ করে তখন খুব চাপের সৃষ্টি করে। হৃৎপিন্ড প্রতিবার সংকোচনের ফলে চাপের ঢেউ সব ধমনীতে (Artery) ছড়িয়ে পরে। ধমনীর মধ্যে চাপের এই ঢেউকে নাড়ী (Pulse) বলা হয়। নাড়ী নির্ভর করে হৃৎপিন্ডের স্পন্দনের হারের উপর এবং হৃৎপিন্ডের প্রতি সংকোচনের সময় যে পরিমাণ রক্ত পাম্প করে তার পরিমানের উপর। নিলয় যখন শিথিল (Relax) হয় তখন নাড়ীর বিরতি ঘটে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে নাড়ী অনুভব করা যায়। যেমন- কব্জির সামনে। (Radial Pulse), কনুই-এর সামনে (Brachial pulse), ঘাড়ের সামনে (Carotid pulse) এবং কুচকির পাশে (Femoral pulse)। প্রাপ্ত বয়স্ক একজন মানুষের স্বাভাবিক হৃদস্পন্দের হার (Pulse Rate) প্রতি মিনিটে ৬০-৯০ বার।

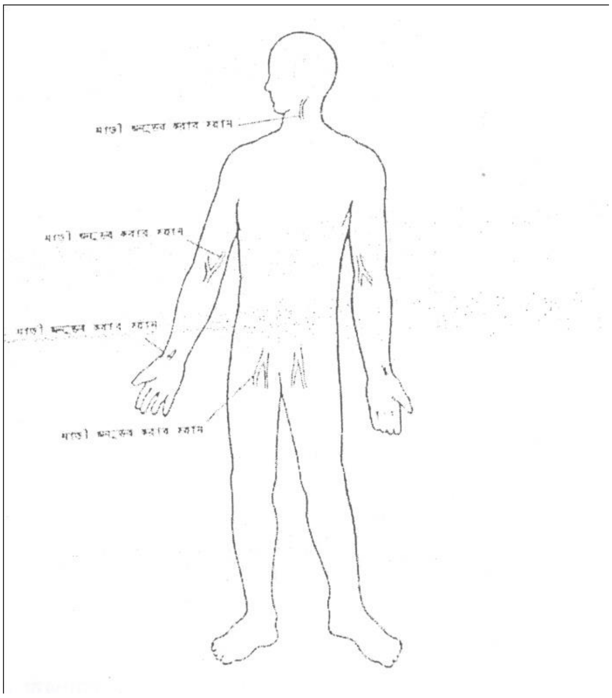

চিত্র - ২৭ ঃ পাল্‌স অনুভব করার স্থান

রক্তচাপ (Blood Pressure)

যেহেতু হৃৎপিন্ড সংকোচিত হয়ে ধমনীতে রক্ত প্রেরণ করে। সে কারণে রক্ত চাপের মধ্যে থাকে। যখন হৃৎপিন্ড শিথিল হয়, ধমনীর রক্ত তখন কম চাপের মধ্যে থাকে। সেজন্য প্রত্যেক বার হৃদস্পন্দনের সময় ধমনীর রক্ত একটি চক্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। রক্ত ধমনী পথে প্রবাহের সময় ধমনীর দেয়ালে যে পরিমাণ পার্শ্বচাপ লম্বভাবে প্রয়োগ করে তাকে রক্তচাপ (Blood Pressure) বলে। পারদ দেয়া একটি বিশেষ যন্ত্র দিয়ে রক্ত চাপ মাপা হয়ে থাকে। তাই রক্ত চাপ মাপার পর millimeter of mercury সংক্ষেপে mm of Hg লেখা হয়। পারদ বা mercury এর রাসায়নিক সংকেত হল Hg.

সিষ্টোলিক রক্তচাপ (Systolic Blood Pressure) বাম নিলয়ের সংকোচনের (Contraction) ফলে সৃষ্টি হয়। ডায়াষ্টোলিক রক্তচাপ (Diastolic Blood Pressure) বাম নিলয়ের শিথিলতার (Relaxation) ফলে হয়ে থাকে। সিষ্টোলিক রক্তচাপ ১০০-১৪০ মিঃ মিঃ মার্কারী এবং ডায়াষ্টোলিক রক্তচাপ ৬০-৯০ মিঃমিঃ মার্কারীর মধ্যে থাকলে একে স্বাভাবিক রক্তচাপ (Normal Blood Pressure) বলে।

উচ্চ রক্তচাপের অর্থ হচ্ছে গড় স্বাভাবিক রক্তচাপের তুলনায় সব সময় সিষ্টোলিক এবং ডায়াষ্টোলিক রক্তচাপ বেশী থাকা এবং নিম্ন রক্তচাপের অর্থ হচ্ছে স্বাভাবিকের তুলনায় সিষ্টোলিক এবং ডায়াষ্টোলিক রক্তচাপ কম থাকা। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রকে স্ফিমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer) বলে।

খুব উচ্চ রক্তচাপ এবং খুব নিম্ন রক্তচাপ উভয়ই অসুখের লক্ষণ। বিভিন্ন কারণে রক্তচাপ প্রভাবিত হয়। যদি রক্তনালী ফুলে যায় বা প্রসারিত হয় যেমন- এলার্জিক প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায় অথবা রক্তের তরল পদার্থ কমে যায় বা রক্তক্ষরণের ফলে রক্তের পরিমাণ কমে যায়, তখন সাধারণতঃ রক্তচাপ কমে যায়। এ অবস্থাকে নিম্ন রক্তচাপ বলে। রক্ত নালী কোন কারণে সরু অথবা সংকোচিত হয়ে গেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়। এ অবস্থাকে উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension) বলা হয়।

পাঠ - ১৪
রক্তের উপাদান ও কার্যাবলী

রক্ত (Blood)

রক্ত এক প্রকার লাল বর্ণের অস্বচ্ছ, আন্তঃকোষীয় তরল যোজন কলা। ইহা রক্তসংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। এটি ঈষৎ ক্ষারীয়। রক্তের তাপমাত্রা ৩৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে ৩৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অজৈব লবণের জন্য রক্ত লবণাক্ত। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ১.০৬৫। একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ্য মানুষের শরীরে ৫ থেকে ৬ লিটার রক্ত থাকে। রক্ত প্রতিটি কোষে অক্সিজেন এবং খাদ্য নিয়ে যায় এবং কোষ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় পদার্থ ফেরত নিয়ে আসে। রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক এক প্রকার পদার্থ থাকে। এই হিমোগ্লোবিনের জন্য রক্ত লাল দেখায়।

রক্ত নিম্নলিখিত উপাদান দিয়ে গঠিত ঃ

ক) লোহিত কণিকা (Red Blood Cell)

খ) শ্বেত কণিকা (White Blood Cell)

গ) অণুচক্রিকা (Platelet) এবং

ঘ) প্লাজমা বা রক্তরস (Plasma)

ক) লোহিত কণিকা (Red Blood Cell)

লোহিত কণিকা গোলাকার দ্বি-অবতল নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতির মত লাল বর্ণের কোষ। এগুলো ক্ষুদ্রতম রক্তনালীর মধ্য দিয়ে সহজেই অতিক্রম করতে পারে। শরীরে লোহিত কণিকা অবিরাম তৈরী হচ্ছে। একটি লোহিত কণিকা গড়ে প্রায় চার মাস বাঁচে। আয়ু ফুরিয়ে গেলে এই কণিকা ধ্বংস হয়ে যায়। জন্মের পর থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত মানব দেহের লম্বা অস্থির অস্থি মজ্জা (Bone Marrow) থেকে লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয়। পরবর্তী সময় ষ্টার্নাম, ভার্টিব্রা, রিব্স ইত্যাদি অস্থির অস্থি মজ্জা থেকে এ কণিকা উৎপন্ন হয়।

হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin) কি?

হিমোগ্লোবিন এক জাতীয় প্রোটিন যৌগ। এটি লোহিত কণিকার ৯৫% গঠন করে এবং কোষকে লাল বর্ণ প্রদান করে। এর ২টি অংশ আছে। যথা- হিম এবং গ্লোবিন। হিম এর ভেতর আয়রন থাকে। আর গ্লোবিন হল এক প্রকার প্রোটিন। হিমোগ্লোবিন রক্তের অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রন করে। হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ হল ফুসফুস হতে কলায় O_2 বহন করা এবং কলা হতে Co_2 বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যাওয়া। রক্তে লোহিত কণিকা অথবা হিমোগ্লোবিন কমে গেলে যে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে রক্তস্বল্পতা (Anaemia) বলে। ঘন ঘন

বাচ্চা প্রসব করলে মায়েদের রক্তস্বল্পতা বা এনেমিয়া দেখা দেয়। পূর্ণ বয়স্ক একজন পুরুষের দেহে প্রতিঘন মিঃলিঃ রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ এবং একজন মহিলার দেহে প্রায় ৪৫ লক্ষ।

লোহিত কণিকার কাজ

১। এর অভ্যন্তরস্থ হিমোগ্লোবিন দেহের সর্বত্র অক্সিজেন বহন করে।

২। নিস্কাশনের (Excretion) জন্য কার্বন ডাই অক্সাইড কলা হতে ফুসফুসে বহন করে।

৩। ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে পিত্তের (Bile) প্রধান রঞ্জক বিলিরুবিন (Bilirubin) উৎপন্ন করে।

৪। আয়নিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

খ) শ্বেত কণিকা (White Blood Cell)

শ্বেত কণিকা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন বিহীন নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ। রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, যেমন- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবি ইত্যাদির বিরুদ্ধে শ্বেত কণিকা শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। কিছু কিছু শ্বেত কণিকা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে চতুর্দিকে ঘিরে ভক্ষন করে রোগ প্রতিরোধ করে। অন্যান্য শ্বেত কণিকা এন্টিবডি (Antibody) নামক এক প্রকার পদার্থ তৈরী করে যা জীবাণুকে ধ্বংস করে। শ্বেত কণিকার কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। প্রয়োজনে এরা আকার পরিবর্তনে সক্ষম। মানব দেহে প্রতি ঘন মি.লি. রক্তে সাধারণতঃ ৪-১১ হাজার শ্বেত কণিকা থাকে। দানাদার শ্বেত কণিকা লাল অস্থি মজ্জা থেকে এবং অন্যান্য শ্বেত কণিকা প্লীহা (Spleen), লসিকা গ্রন্থি (Lymph Node) এবং আংশিকভাবে অস্থি মজ্জা (Bone Marrow) থেকে উৎপন্ন হয়। শ্বেত কণিকার গড় আয়ু প্রায় ২০ দিন।

আকৃতি ও গঠনগত ভাবে শ্বেত কণিকাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। দানাদার শ্বেত কণিতা

- নিউট্রোফিল (Neutrophil)
- ইওসিনোফিল (Eosinophil) ও
- বেসোফিল (Basophil)

২। দানাহীন শ্বেত কণিকা

- লিম্ফোসাইট (Lymphocyte)
- মনোসাইট (Monocyte)

গ) অণুচক্রিকা (Platelet)

অনুচক্রিকা ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা। এগুলো ডিম্বাকার, দানাদার কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন। মানব দেহে প্রতিঘন মিঃলিঃ রক্তে অনুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় দেড় থেকে পাঁচ লক্ষ। অনুচক্রিকার গড় আয়ু ৫-১০ দিন। অনুচক্রিকা রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। রক্তনালী কোটে গেলে রক্ত জমাট বেঁধে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে।

ঘ) রক্তরস (Plasma)

রক্তরস হচ্ছে রক্তের তরল অংশ। এ রক্তরসকে সিরাম বলা (Serum) হয়ে থাকে। পানি, খাদ্য উপাদান এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থ নিয়ে ইহা গঠিত। সংক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইহা সাহায্য করে এবং রক্তকে জমাট বাধায়। এ রসের আমিষগুলো পানিকে রক্তনালী থেকে বের হতে দেয় না। আমিষের পরিমাণ কমে গেলে পানি রক্তনালী থেকে বের হয়ে দেহের কলায় (Tissue) প্রবেশ করে। ফলে কলাগুলো ফুলে যায়। এই ফুলে যাওয়াকেই শোথ (Oedema) বলা হয়।

রক্তরসের উপাদানসমূহ

১। জৈব পদার্থ- প্লাজমা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বহাইড্রেট, ইউরিয়া, হরমোন ইত্যাদি।

২। অজৈব পদার্থ- সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়রণ, ক্যালসিয়াম, সালফেট, বাই কার্বনেট ইত্যাদি।

রক্তরসের কাজ

১। পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন কলা বা অংগে ধাবিত হয়

২। কলা হতে বর্জ্যদ্রব্য বাহির হয়ে নিঃসরনের জন্য রক্তরসের মাধ্যমে কিডনীতে ধাবিত হয়

৩। হরমোন সমূহকে বিভিন্ন অংগে নিয়ে যায়

৪। রক্তের অম্লক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে।

পাঠ - ১৫

লসিকা তন্ত্র ঃ লসিকা নালী, লসিকা গ্রন্থি এবং প্লীহা

লসিকা তন্ত্র (Lymphatic system) ঃ এ তন্ত্র লসিকা গ্রন্থি, লসিকা নালী এবং প্লীহার সমন্বয়ে গঠিত।

ক) লসিকা গ্রন্থি (Lymph Node or Lymph Gland) ঃ অসংখ্য লসিকা নালী দেহের বিভিন্ন অংশে জমে থাকা লসিকা রস শিরায় বহন করে আনে। এ নালীগুলো কিছু গ্রন্থির মত বস্তুর মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে এবং লসিকারস পরিশ্রুত করার জন্য ফিল্টারের মত কাজ করে। এ গ্রন্থিগুলোকেই লসিকা গ্রন্থি বলে। গ্রন্থিগুলো বগল, ঘাড়, কুঁচকি ইত্যাদি স্থানে দলে দলে ছড়িয়ে আছে। লসিকা গ্রন্থিগুলো লসিকা কলা নামে এক ধরণের বিশেষ কলা দ্বারা গঠিত। লসিকা গ্রন্থিগুলোর নিকটবর্তী স্থানে জীবাণু সংক্রমণ ঘটলে এগুলো ফুলে যায়।

খ) লসিকা নালী (Lymphatic Duct) ঃ এ নালীগুলো কলার মধ্যবর্তী স্থানে অনবরত জমা হওয়া অতিরিক্ত তরল পদার্থ বয়ে নিয়ে বড় শিরা, যেমন- Superior Vena Cava এবং Inferior Vena Cava এর মধ্যে নির্গত করে। এ তরলকে লসিকারস (Lymph) বলা হয়। এ তরল লসিকারস, কলার রস, বর্জ্য পদার্থ এবং কিছু কলার ধ্বংসাবশেষ নিয়ে গঠিত।

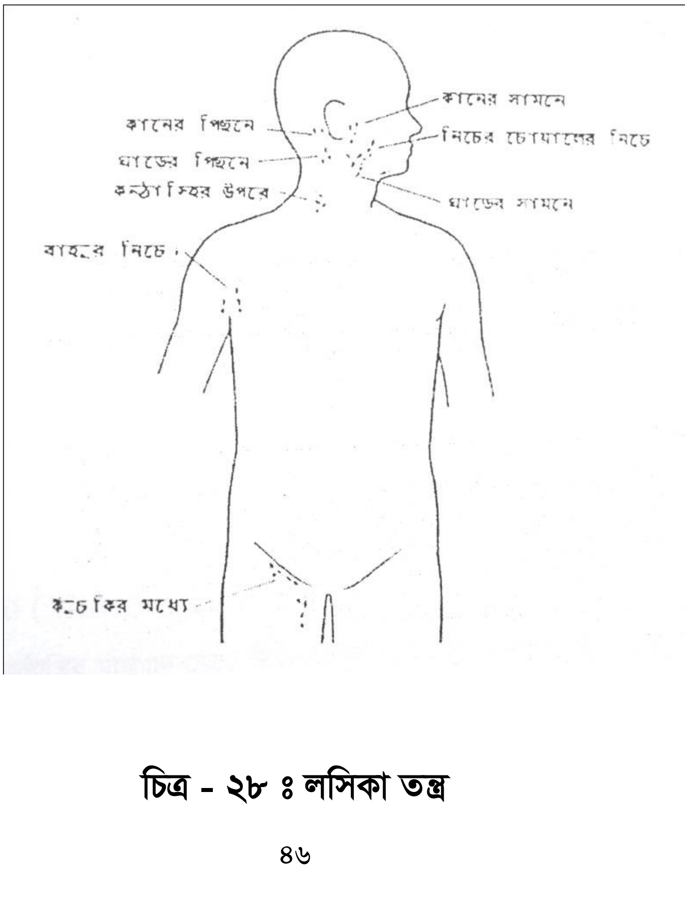

চিত্র - ২৮ ঃ লসিকা তন্ত্র

এসব গ্রন্থির প্রধান কাজ হচ্ছে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, যেমন- জীবাণুযুক্ত কোষ (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস) এবং অন্যান্য দূষিত পদার্থ দূর করে লসিকা রসকে বিশুদ্ধ করা। এছাড়া ইহা লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) নামক কিছু শ্বেত কণিকা তৈরী করে।

গ) স্প্লীন (Spleen) ঃ ইহা লসিকা তন্ত্রের একটি অংগ। এটা পেটের বাম পার্শ্বের উপরের চর্তুথাংশে অবস্থিত। ইহা আকৃতিতে কিছুটা সমতল এবং ৫-৬ ইঞ্চি (১২-১৫ সে.মি.) লম্বা ও ২-৩ ইঞ্চি (৫-৭.৫ সে.মি) চওড়া। স্প্লীন একটি নরম, বেগুনী রঙের অংগ যার মধ্যে দিয়ে প্রচুর রক্ত চলাচল করে। সুস্থ শরীরে এটা হাত দিয়ে অনুভব করা যায় না। তবে বিশেষ বিশেষ রোগ, যেমন- ম্যালেরিয়া, কালা জ্বর, থ্যালাসেমিয়া ইত্যাদি রোগে বড় হতে পারে এবং তখন হাত দিয়ে অনুভব করা যায়।

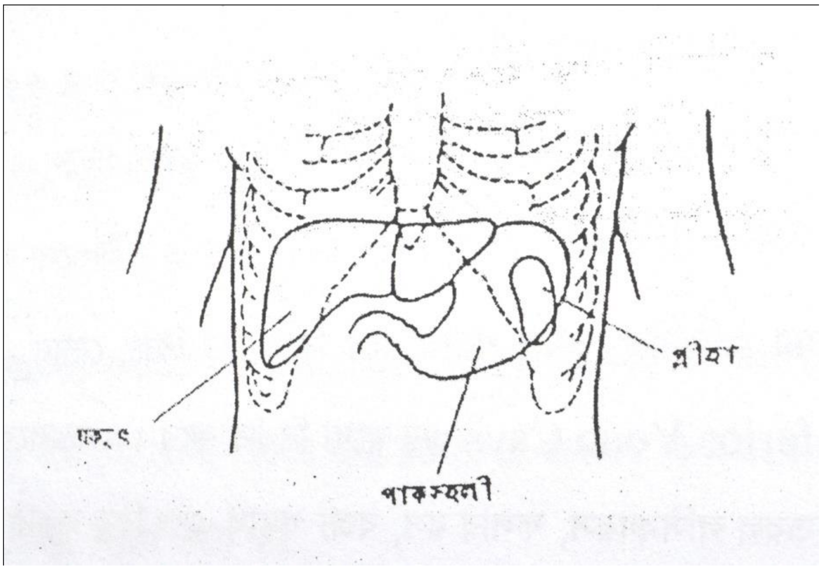

চিত্র - ২৯ ঃ স্প্লীন-এর অবস্থান

স্প্লীনের কার্যাবলী

১) লিম্ফোসাইট তৈরী করে।

২) রক্তকে পরিশোধিত করে এবং বর্জ্য পদার্থ যেমন- কোষ এবং জীবাণু ইত্যাদি গ্রাস করে

৩) রোগ প্রতিরোধ করার জন্য শরীরে এন্টিবডি তৈরী করে

৪) লোহিত কণিকাগুলো তাদের জীবন অতিবাহিত করার পর স্প্লীন-এ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়

৫) লোহিত কণিকার ভান্ডার হিসাবে কাজ করে এবং শরীরে প্রয়োজনের সময় রক্তে ছেড়ে দেয়।

পাঠ - ১৬
বক্ষের গঠন এবং শ্বাস তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

বক্ষের গঠন

শ্বাস তন্ত্রের বেশীর ভাগ অংগই একটি অস্থি দ্বারা গঠিত ও একটি খাঁচা দ্বারা আবদ্ধ যাকে বক্ষ বা বুক (Chest) বলা হয়। বক্ষ গলার নীচ থেকে পাঁজরের নিম্ন প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বুকের সামনের দিকের মাঝখানে রয়েছে স্টারনাম (Sternum)। বুকের সামনের বেশীর ভাগ অংশ, পার্শ্ব এবং পিছন দিক ১২ জোড়া পাঁজরাস্থি দ্বারা গঠিত হয়েছে। দুই রিব্‌স-এর মধ্যবর্তী স্থানকে (Intercostal Space) বলে। এই স্থানের মধ্য দিয়ে হৃৎপিন্ড ও শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বক্ষের ভিতরে শ্বাস তন্ত্রের বেশীর ভাগ অংগ, যেমন- ফুসফুস, প্রধান বায়ুনালী, ফুসফুসের পর্দা ইত্যাদি এবং রক্তসংবহন তন্ত্রের প্রধান অংগ হৃদপিন্ড থাকে। স্ক্যাপুলা (Scapula) বুকের পিছনের উপরের অংশের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা বুকের পিছনের এবং কিছুটা পার্শ্বে উপরের দিকের রিব্‌স গুলো (Ribs) ঢেকে রাখে। ক্ল্যাভিকল (Clavicle) বুকের খাঁচার উপর পার্শ্বে স্টারনাম (Sternum) থেকে স্ক্যাপুলা পর্যন্ত প্রসারিত। ক্ল্যাভিকল উভয় দিকে প্রথম পাঁজরাস্থির উপর অবস্থিত।

বুকের কিছু কিছু চিহ্ন বুকের ভিতর অবস্থিত বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগের অবস্থান নির্ণয়ে সাহায্য করে।

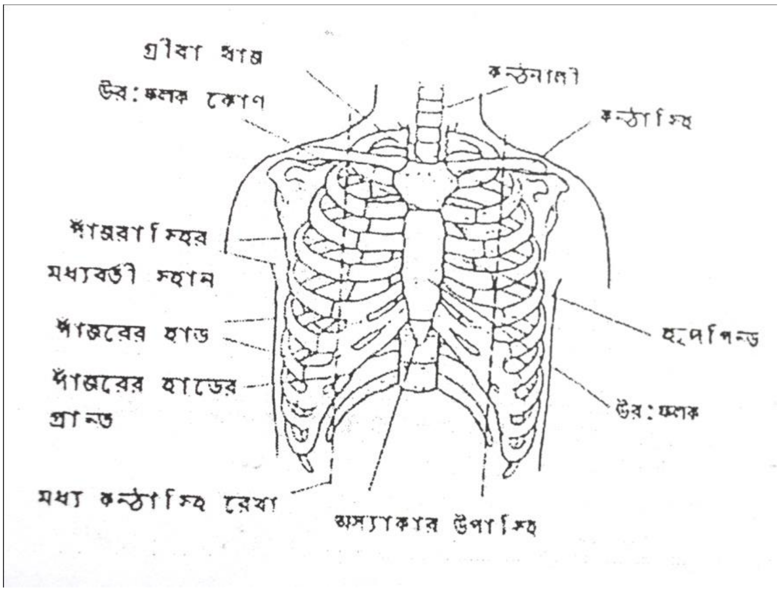

চিত্র - ৩০ ঃ বক্ষের গঠন

মধ্য কণ্ঠাস্থি রেখা (Mid-clavicular Line)

এটা হচ্ছে প্রতিটি ক্ল্যাভিকল-এর মাঝখান থেকে নীচে বরাবর বুকের দুই পার্শ্বে দু'টি কল্পিত রেখা। হৃৎপিন্ড বাম মধ্য ক্ল্যাভিকল রেখার একটু ভিতরে অবস্থিত। হৃৎপিন্ডের শীর্ষস্থান (Apex) পঞ্চম ও ষষ্ঠ রিব্‌স-এর মধ্যস্থিত স্থানে অবস্থিত।

স্টারনাল এ্যাংগেল (Sternal Angle)

স্টারনাম-এর উপরের প্রান্তে একটি গর্তের মত স্থান আছে যাকে গ্রীবা খাঁজ (Supra sternal notch) বলা হয়। এ খাঁজের প্রায় এক ইঞ্চি নীচে একটি উঁচু অস্থির স্থান আছে, তাকে স্টারনাল এ্যাংগেল (Sternal Angle) বলে। এই স্টারনাল এ্যাংগেল দ্বিতীয় রিব্‌স-এর সমতল নির্দেশ করে। দ্বিতীয় রিব্‌স-এর নীচেই দ্বিতীয় রিব্‌স-এর মধ্যস্থিত স্থান। অন্যান্য রিব্‌স-এর স্থান বের করার জন্য এই স্থান থেকে গণনা শুরু করতে হয়। বায়ুনালী (Bronchus) এই স্টারনাল এ্যাংগেল-এর ঠিক নীচ থেকেই দুই শাখায় ভাগ হয়ে যায়। ষ্টারনামের তিনটি অংশ। উপরের চতুস্কোন পুরু অংশ মেনুব্রিয়াম ষ্টারনি (Manubrium sterni), মাঝে সরু লম্ব অংশ দেহ (Body) এবং নীচের ছোট অংশ জিফয়েড প্রসেস (Xiphoid process)। মেনুব্রিয়াম ষ্টারনি এবং দেহের সংযোগ স্থলকেই স্টারনাল এ্যাংগেল বলে।

জিফয়েড প্রসেসের উভয় পার্শ্বে এবং পাঁজরের প্রান্ত দিয়ে নেমে যাওয়া অংশকে রিব্ মারজিন (Rib Margin) বলে। ফুসফুসের নীচের প্রান্ত সামনের দিকে ষষ্ঠ রিব্‌স পর্যন্ত প্রসারিত এবং বাঁকা হয়ে পেছনের দিকে দশম রিব্‌স-এর সমতলে শেষ হয়েছে।

শ্বাস তন্ত্রের (Respiratory System) বিভিন্ন অংশ

শ্বাস তন্ত্রের মাধ্যমে বাতাস বাহির থেকে ভিতরে অর্থাৎ ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং ফুসফুস থেকে বাইরে বের হয়ে যায়। আমরা যখন শ্বাস নেই তখন অক্সিজেন পূর্ণ বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। আবার যখন শ্বাস ত্যাগ করি তখন কার্বন ডাই অক্সাইড পূর্ণ বাতাস ফুসফুস থেকে বাইরে বের হয়ে যায়। শ্বাস তন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) নাসিকা গহ্বর (Nasal cavity) বা নাক (Nose)

২) ফ্যারিংস বা গলবিল (Pharynx)

৩) ল্যারিংস বা স্বরযন্ত্র (Larynx)

৪) ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী (Trachea)

৫) প্রধান বায়ুনালী (Principal Bronchus)

- ডান (Right)
- বাম (Left)

৬) ফুসফুস (Lung)

- ডান (Right)
- বাম (Left)

প্রতিটি ফুসফুসের অণুশাখা ঃ

- বায়ুনালীর প্রধান অনুশাখা (Bronchioles)
- এ্যালভিওলাই বা বায়ুকোষ (Alveoli)

৭) প্লুরা বা ফুসফুসের পর্দা (Pleura)

৮) ডায়াফ্রাম বা মধ্যচ্ছেদা (Diapharagm)।

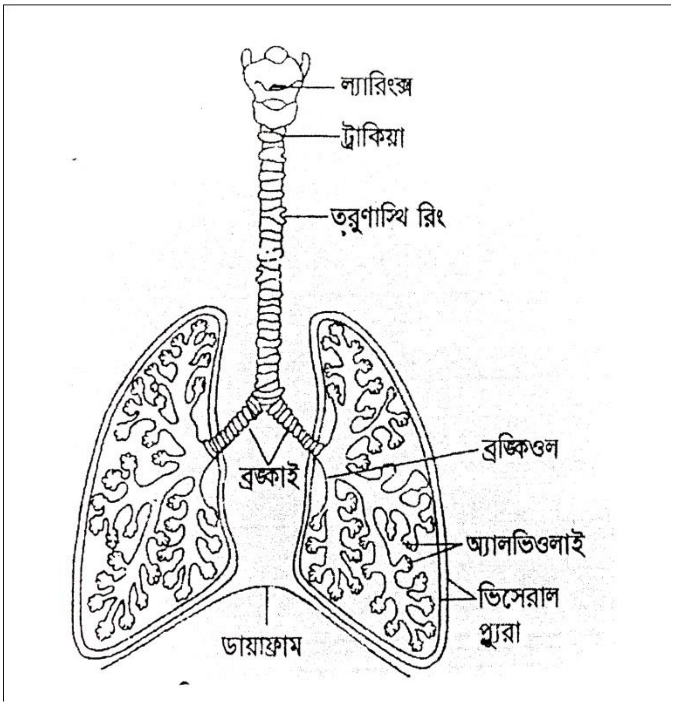

চিত্র - ৩১ ঃ শ্বাস তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

১) নাসিকা গহ্বর/ নাক (Nasar Cavity/Nose)

নাসিকা ভেদক (Nasal septum) দ্বারা নাসাপথ ডান ও বাম নাসারন্ধ্রে বা নাকের ছিদ্রে বিভক্ত। এই ভেদকটি অস্থি এবং তরুনাস্থি দিয়ে তৈরি। শ্লেষ্মা ঝিল্লী আবরণ দ্বারা নাসিকা ভেদক এবং নাকের ভেতরের অংশ আচ্ছাদিত। শ্বাস নেয়ার সময় শ্লেষ্মা ঝিল্লি বাতাসে পরিস্কার, উষ্ণ এবং আর্দ্র করে। নাসিকা ভেদকের

শ্লেষ্মা ঝিল্লীতে প্রচুর রক্ত সরবরাহ থাকে। এই অংশ আঘাত প্রাপ্ত হলে সহজেই অনেক রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। মুখের অস্থি দ্বারা গঠিত মুখ গহ্বরের ছাদ (Roof) নাকের ভেতরের অংশকে মুখ থেকে পৃথক করে রাখে। নাকের ভেতরের অংশ গলার উপরের অংশের সাথে মিশেছে।

২) ফ্যারিংস (Pharynx)

ইহা নাসিকা গহ্বর এবং শ্বাস নালীর উর্ধ্বভাগের মধ্যে অবস্থিত। ইহা পেশী দিয়ে তৈরী একটি পথ। এই একই পথের মধ্য দিয়ে বাতাস শ্বাস তন্ত্রে এবং খাদ্য পরিপাক তন্ত্রে প্রবেশ করে।

৩) ল্যারিংস (Larynx)

ফ্যারিংস ও ট্রাকিয়া (Trachea) এর মাঝখানে ল্যারিংস অবস্থিত। আপনি গলার সম্মুখভাগে ল্যারিংস-এর প্রলম্বিত স্থান (Laryngeal Prominence) অনুভব করতে পারেন। শ্বাস নালীর উপরে একটি ঢাকনা বা উপজিহ্বা (Epiglotis) আছে। খাবার গেলার সময় এই ঢাকনা বন্ধ হয়ে যায় যাতে খাবার শ্বাস নালীতে ঢুকতে না পারে।

৪) ট্রাকিয়া (Trachea)

ট্রাকিয়া হচ্ছে একটি বায়ুর নল বা টিউব। ইহা স্বরযন্ত্র থেকে বুকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে দুই প্রধান বায়ু নালীতে (Principal Bronchus) বিভক্ত হয়েছে। বাতাস এই নলের মাধ্যমেই ফুসফুসে প্রবেশ করে।

৫) প্রধান বায়ুনালী (Principal Bronchus)

প্রতিটি ফুসফুসে একটি প্রধান বায়ুনালী প্রবেশ করেছে। ডান প্রধান বায়ুনালী বাম প্রধান বায়ুনালী অপেক্ষা অনেক প্রশস্ত এবং সোজাসুজি ফুসফুসে প্রবেশ করেছে। যে কারণে বাহিরের কোন পদার্থ ডান ফুসফুসে প্রবেশ করার সম্ভাবনা বেশী থাকে। বায়ুনালী ফুসফুসের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখায় (Bronchioles) বিভক্ত হয়েছে।

৬) ফুসফুস (Lung)

বুকের ভিতর দুই পার্শ্বে দুইটি ফুসফুস অবস্থিত। ডান ফুসফুসে ৩টি লোব (Lobe) এবং এবং বাম ফুসফুসে ২টি লোব (Lobe) আছে। ফুসফুস অসংখ্য বায়ুকোষ (Alveoli) নিয়ে গঠিত। এগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ বিশেষ এবং অনেকটা বেলুনের মত। শ্বাস গ্রহণের সময় এগুলো ফুলে যায় এবং শ্বাস ত্যাগের সময় এগুলো চুপসে যায়। এর চর্তুদিকে অসংখ্য কৈশিকনালী থাকে। এই কৈশিকনালীর স্তরের সংগে অক্সিজেন যুক্ত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করে।

৭) প্লুরা (Pleura)

ইহা উভয় ফুসফুসকে আবৃত করে রাখে। ইহা ২টি স্তরে বিভক্ত। ভিতরের স্তর ফুসফুসকে আবৃত করে রাখে এবং বাহিরের স্তর বক্ষের ভিতরে দেয়ালকে ঘিরে রাখে। ফলে দুই স্তরের মাঝে একটি ফাকা জায়গার সৃষ্টি হয়ে থাকে। একে (Pleural cavity) বলে। বিভিন্ন অসুখে এই জায়গায় তরল পদার্থ (Fluid), রক্ত বা পূঁজ জমতে পারে। এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে অসুবিধা হয় এবং বুকে ব্যথা অনুভব হয়।

৮) ডায়াফ্রাম (Diaphragm)

এটি একটি মাংসপেশীর পর্দা যা বক্ষকে উদর থেকে পৃথক করে। ডায়াফ্রাম ফুসফুসের ঠিক নীচেই অবস্থিত। এই পর্দাটি শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

পাঠ - ১৭

শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া, শ্বাস তন্ত্রের কার্যাবলী এবং নাকের আশে পাশের সাইনাস

শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া

শ্বাস গ্রহণ (Inspiration) এবং শ্বাস ত্যাগ (Expiration) এ দুই কার্যের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

ক) শ্বাস গ্রহণ (Inspiration)

শ্বাসতন্ত্রের মাধ্যমে বাতাস ভেতরে নেয়াকে শ্বাস গ্রহণ বা Inspiration বলে। ফুসফুস যখন প্রসারিত হয় তখন বাতাস ভেতরে প্রবেশ করে। মধ্যচ্ছেদা (Diaphragm) এবং পাঁজরাস্থির (Ribs) মাংসপেশী ফুসফুসকে প্রসারিত করে। মধ্যচ্ছেদা হচ্ছে একটি পুরু পেশীর পর্দা। মধ্যচ্ছেদা নীচের দিকে টান হলে ফুসফুস প্রসারিত হয়। পাঁজরের মধ্যস্থিত মাংসপেশী সংকুচিত হলে পাঁজর উপরের দিকে উঠে আসে। বুক আকারে বড় হলে ফুসফুস বাতাস ভেতরে টেনে নেয়। শ্বাস-গ্রহণের সময় আমরা বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করি।

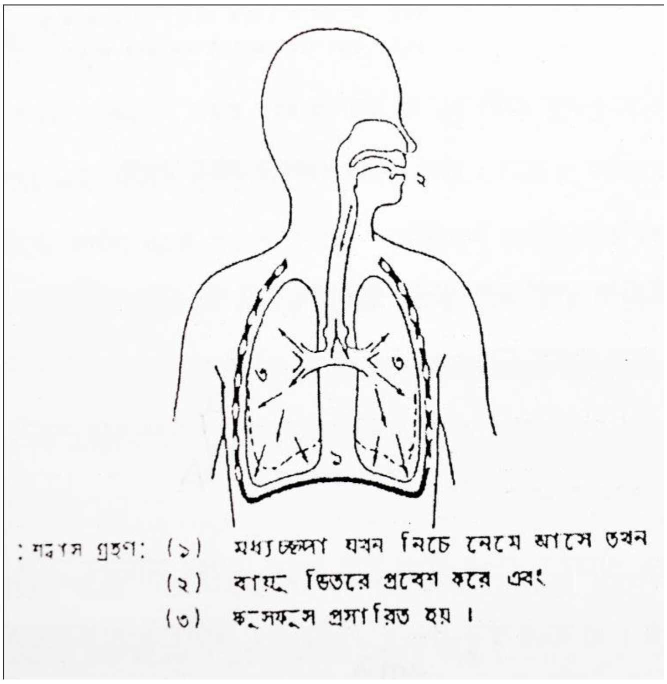

চিত্র - ৩২ ঃ শ্বাস গ্রহণ

খ)   শ্বাস ত্যাগ (Expiration)

ফুসফুস থেকে বাতাস শরীরের বাইরে বের করে দেয়াকে শ্বাস ত্যাগ বা Expiration বলে। মধ্যচ্ছেদা যখন উপরের দিকে উঠে এবং পাঁজরের মধ্যস্থিত মাংসপেশী শিথিল হয় তখন বুক সংকুচিত হয়। ফলে ফুসফুস বাতাসকে সজোরে বের করে দেয়। শ্বাস ত্যাগ করার সময় কার্বন ডাই অক্সাইড শরীর থেকে বের হয়ে যায়। যে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ মধ্যচ্ছেদা সচেষ্ট থাকে এবং বুকের দেয়ালগুলো প্রায় বিশ্রামে থাকে সেই শ্বাস-প্রশ্বাসকে উদরীয় শ্বাস-প্রশ্বাস (Abdominal type of Respiration) বলা হয়। বিশ্রামে থাকা অবস্থায় যে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস হয় তাহাই উদরীয় শ্বাস-প্রশ্বাসের উদাহরণ।

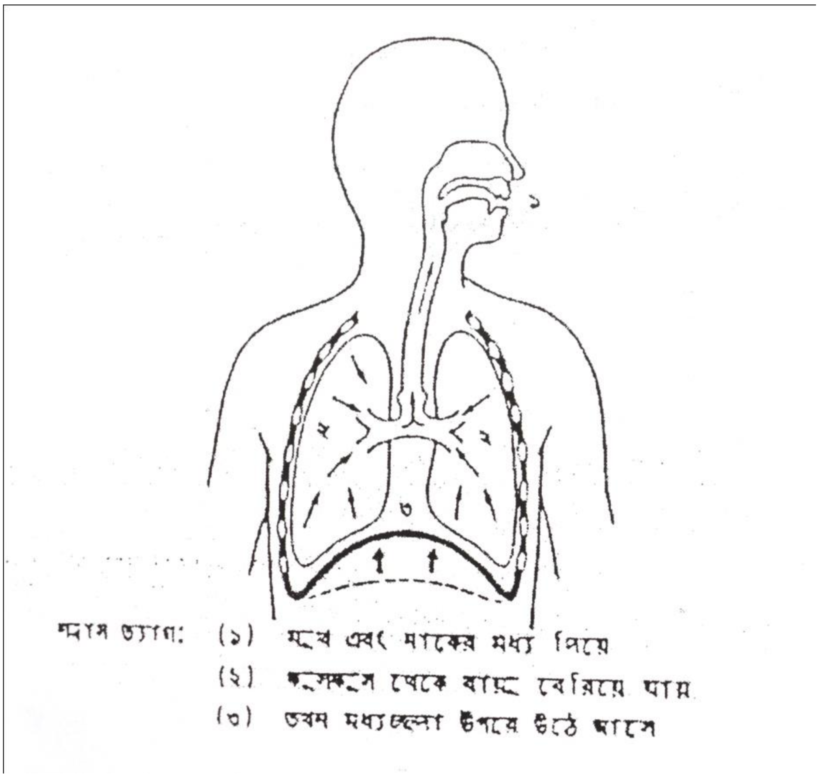

চিত্র - ৩৩ ঃ শ্বাস ত্যাগ

আবার যে শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বুকের প্রসারের জন্য হয় এবং পেটের কোন নড়াচড়া হয় না এরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসকে বক্ষীয় শ্বাস-প্রশ্বাস (Thoracic type of Respiration) বলা হয়। ডায়াফ্রাম বা অন্ত্রাবরক ঝিল্লিতে (Peritoneum) প্রদাহ হলে, পেটে শক্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা হলে অথবা পেটের কোন অপারেশনের পর এই ধরণের শ্বাস-প্রশ্বাস দেখা যায়।

ব্যায়াম করার সময় পাজর উপরের দিকে উঠে আসে, বুকের আয়তন বেড়ে যায় এবং অনেক বেশি বাতাস ফুসফুসে টেনে নেয়। এ সময় শ্বাস-প্রশ্বাস উদরীয় এবং বক্ষীয় উভয় প্রকার হয়ে থাকে।

ফুসফুস এবং বুকের দেয়ালের মধ্যের খালি জায়গাকে প্লুরাল স্পেস (Pleural Space) বলা হয়। এই জায়গায় একটি ঝিল্লির আস্তরণ থাকে যাকে প্লুরা (Pleura) বলে। এখানে প্রকৃত পক্ষে কোন জায়গা থাকে না। কেননা ঝিল্লির উভয় স্তর একে অপরের সংলগ্ন। কোন প্রদাহ হলে এই বক্ষাবরক ঝিল্লির মাঝে তরল পদার্থ (Fluid) দিয়ে ভরে যায় ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় অসুবিধা হয় এবং বুকে ব্যাথা হয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসের হার গণনা

মারাত্মক অসুস্থতা, ইনজুরি বা দুর্ঘটনায় আক্রান্ত কোন শিশু বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার জানা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কি?

শ্বাস-প্রশ্বাস বলতে বোঝায় একবার শ্বাস গ্রহণ এবং একবার শ্বাস ত্যাগ। এভাবে কোন ব্যক্তি ১ মিনিটে কতবার শ্বাস নেয় এবং ত্যাগ করে সেই সংখ্যাকে ''শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বলে"। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের হার ভিন্ন ভিন্ন বয়সে সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন হয়। বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নিম্নরূপ ঃ

বয়স	স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের হার
জন্মের পর হতে - ২ মাস বয়স পর্যন্ত	৬০ বারের কম
২ মাস পর হতে - ১২ মাস বয়স পর্যন্ত	৫০ বারের কম
১২ মাস পর হতে- ৫ বছর বয়স পর্যন্ত	৪০ বারের কম
বয়স্কদের ক্ষেত্রে	১৪ থেকে ১৮ বার।

শ্বাসতন্ত্রের কার্যাবলী

প্রতিবার শ্বাস গ্রহণের সময় অক্সিজেন সমৃদ্ধ বাতাস নাক বা মুখ দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। শ্বাসনালীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে দিয়ে এই বাতাস ফুসফুসের বায়ুকোষ পর্যন্ত পৌঁছে। অক্সিজেন বায়ুকোষের দেয়ালের মধ্যে দিয়ে কৈশিকনালীতে অর্থাৎ রক্তে প্রবেশ করে। অক্সিজেন লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে সংযুক্ত হয়। লোহিত কণিকা অক্সিজেনকে দেহের বিভিন্ন কোষ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায় যা রক্তসংবহন তন্ত্রে আলোচনা করা হয়েছে। একই সময় কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত থেকে সরে এ্যালভিওলাই (Alveoli) স্থানান্তরিত হয়। তারপর ইহা প্রশ্বাসের মাধ্যমে বাহিরে বাতাসে বেরিয়ে আসে।

সাইনাস (Sinus)

সাইনাস হচ্ছে মুখের অস্থির মধ্যে এক ধরণের গহ্বর যা নাকের ভেতরের সাথে সংযুক্ত। সাইনাস মাথার খুলিকে হালকা রাখে। এগুলি কণ্ঠস্বরের গুণাগুণকেও প্রভাবিত করে।

সাইনাস প্রধানতঃ ২ প্রকার। যথা- ফ্রন্টাল বা কপালের সাইনাস (Frontal Sinus) যা নাকের উপরে দু'চোখের মাঝখানে অবস্থিত এবং ম্যাক্সিলারী সাইনাস (Maxillary sinus) যা নাকের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত।

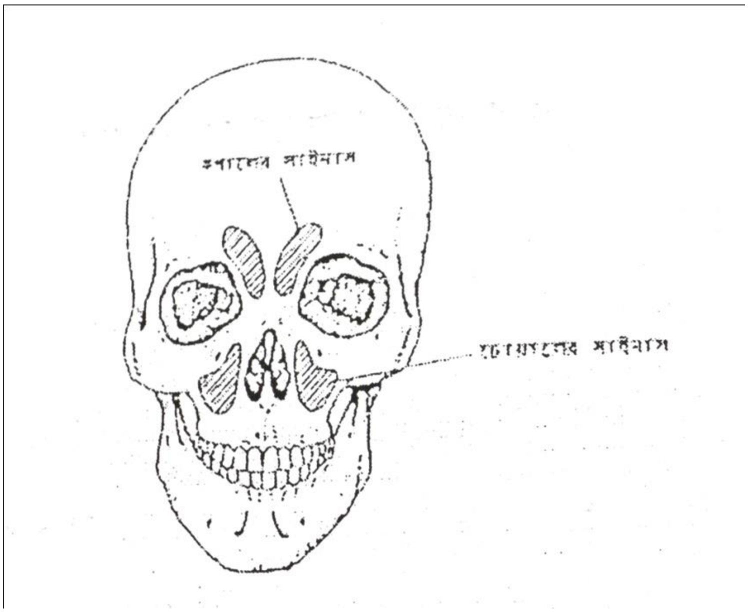

চিত্র - ৩৪ ঃ সাইনাসের অবস্থান

নাক থেকে সংক্রমণ খুব তাড়াতাড়ি সাইনাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সাইনাসে প্রদাহ বা সংক্রমণের ফলে ইহা তরল পদার্থে পূর্ণ হয়ে যায়। এই তরল পদার্থ সাইনাসে আটকে গেলে মাথা ব্যথা হতে পারে। সাইনাসে প্রদাহের ফলে মাথা ব্যথাসহ যে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে সাইনুসাইটিস (Sinusitis) বলে।

পাঠ - ১৮
পরিপাক তন্ত্রের গঠন

পরিপাক তন্ত্র (Digestive System)

যে সমস্ত অংগের মাধ্যমে খাদ্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া শেষে শরীরের কাজে লাগে এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ শরীর থেকে বের হয়ে যায় তাকে একত্রে পরিপাক তন্ত্র বলে। পরিপাক তন্ত্র একটি দীর্ঘ নল দ্বারা গঠিত যা মুখ থেকে শুরু হয় এবং মলদ্বারে শেষ হয়।

পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। মুখ (Mouth)

- ঠোঁট (Lip)
- জিহ্বা (Tongue)
- দাঁত (Teeth)
- গাল (Cheek)

২। ফ্যারিংস বা গলবিল (Pharynx)

- মুখ গহ্বর (Mouth Cavity)
- আলা জিহ্বা (Epiglotis)

৩। অন্ননালী (Esophagus)

৪। পাকস্থলী (Stomach)

- ফান্ডাস (Fundus)
- বডি (Body)
- পাইলোরাস (Pylorus)

৫। ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine)

- ডিওডেনাম (Duodenum)
- জেজুনাম (Jejunum)
- ইলিয়াম (Ilium)

৬। বৃহদান্ত্র (Large Intestine)

- এসেনডিং কোলন (Ascending Colon)
- ট্রান্সভার্স কোলন (Transverse Colon)
- ডিসেনডিং কোলন (Descending Colon)
- সিগময়েড কোলন (Sigmoid Colon)

৭। মলদ্বার (Anus)।

পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্যকারী অংগসমূহ

ক) লালা গ্রন্থি (Salivery gland)

খ) যকৃত (Liver)

গ) অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

ঘ) পিত্তাশয় (Gall Bladder)।

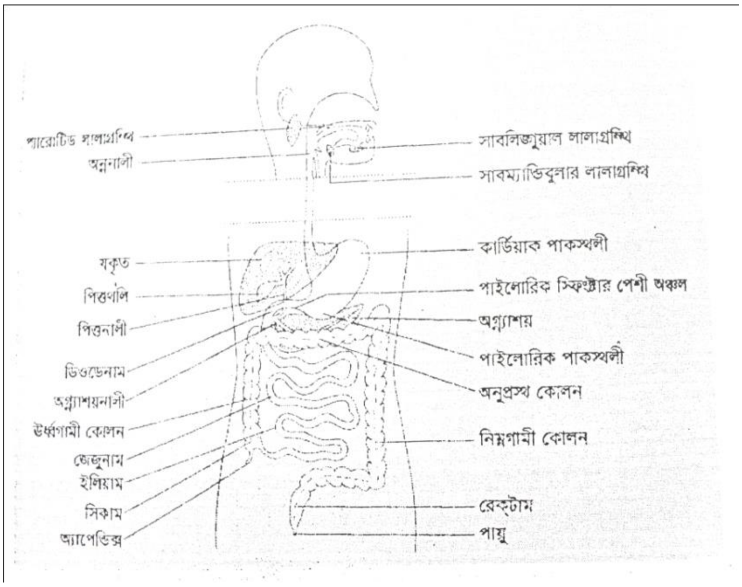

চিত্র - ৩৫ ঃ পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

পাঠ - ১৯
পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন অংশের কার্যাবলী

মুখ ঃ পরিপাক তন্ত্রের প্রথম অঙ্গ। ইহা খাদ্য গ্রহণ করে।

ঠোঁট ঃ খাদ্যকে মুখের ভিতর নিতে সাহায্য করে এবং সঠিক স্থানে খাদ্য ধরে রাখে।

জিহ্বা ঃ স্বাদ গ্রহণের আগে চিবানোর সময় জিহ্বা খাদ্যকে মুখের ভিতর নাড়াচাড়া করতে সাহায্য করে। খাবার গিলার সময় প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জিহ্বা খাদ্যকে গলার ভিতর ঠেলে দেয়।

লালা গ্রন্থি ঃ ইহা লালা (Saliva) নামক এক প্রকার তরল পদার্থ তৈরি করে। ইহা খাবারকে ভিজিয়ে পিচ্ছিল ও নরম রাখে। লালা গ্রন্থি পাচক রস তৈরি করে যা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

দাঁত ঃ দাঁত খাদ্যকে চূর্ণ করে অন্ন নালীর দিকে জিহ্বা দ্বারা পাঠিয়ে দেয়।

অন্ননালী ঃ ইহা খাবার ও তরল পদার্থ মুখ থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত বহন করে।

পাকস্থলী ঃ প্রাথমিক ভাবে খাদ্যের ভান্ডার হিসাবে কাজ করে। খাদ্যকে মসৃন এবং মিশ্রিত করে। পাকস্থলীর আস্তরণ থেকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং অন্যান্য পাচক রস, যেমন- পেপসিন নির্গত হয়ে খাবারকে হজম করতে সাহায্য করে।

ক্ষুদ্রান্ত্র ঃ পাকস্থলীতে খাবার মিশ্রণ ও ভাঙ্গার ফলে ঘন তরলে পরিণত হয়। পাকস্থলী সংকোচনের দ্বারা এই তরলকে পাকস্থলীর নীচের ছিদ্র দিয়ে বের করে দেয়। খাবারের বেশীর ভাগ পরিপাক (Digestion) এবং পানিসহ বিশোষণ (Absorption) এই ক্ষুদ্রান্ত্রে হয়ে থাকে।

বৃহদান্ত্র ঃ ক্ষুদ্রান্ত্র যে সব খাদ্য পরিপাক বা শোষণ করতে পারে না সে সব তখন বৃহদান্ত্রে চলে আসে। বৃহদান্ত্র দেহের বর্জ্য পদার্থগুলো (Waste products) সংগ্রহ করে এবং মলদ্বারের দিকে চালিত করে যাতে শরীর থেকে এগুলো বেরিয়ে যায়।

মলদ্বার ঃ শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ মলদ্বার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

যকৃত ঃ পিত্ত (Bile) উৎপন্ন করে। পিত্ত পিত্তনালীর (Bile duct) মাধ্যমে পিত্তাশয়ে ঘণীভুত হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডেনামে পৌঁছে চর্বি জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে। ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে খাদ্যকণা বিশোষিত হয়ে রক্তের মাধ্যমে যকৃতে পৌঁছে। যকৃত কোন বিষাক্ত দ্রব্য বা ঔষধের বিষাক্ত গুণাগুণ কমিয়ে দেয়। তাছাড়া যকৃত নিম্নলিখিত কাজগুলো করে ঃ

- ভিটামিন সংরক্ষণ করে
- দেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসাবে কাজ করে
- রক্ত জমাট বাঁধার কিছু উপাদান (Factor) তৈরি করে
- বিপাক ক্রিয়ায় (Metabolism) অন্যতম অংগ হিসাবে কাজ করে।

অগ্ন্যাশয় ঃ অগ্ন্যাশয় বিভিন্ন প্রকার খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করার জন্য পাচক রস (Enzyme) উৎপাদন করে। যেমন- অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ইত্যাদি। এগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রে গিয়ে খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয়। তাছাড়া অগ্ন্যাশয় এর কিছু অংশ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine Gland) হিসেবে কাজ করে। এ অংশ থেকে ইনসুলিন (Insulin) এবং গ্লুকাগন (Glucagon) নামক হরমোন তৈরি হয়।

পাঠ - ২০
পরিপাক তন্ত্রের প্রধান কাজ এবং উদরের গঠন

পরিপাক তন্ত্রের প্রধান তিনটি কাজ

ক) **খাদ্য পরিপাক (Digestion) ঃ** দেহের কোষগুলোর বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু খাদ্য ভেঙ্গে পুষ্টিকর পদার্থে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত দেহের কোষগুলো খাদ্যকে ব্যবহার করতে পারে না। খাদ্যের এই ভাঙ্গার প্রক্রিয়াকেই "পরিপাক বা হজম" বলা হয়। দেহের কোষ খাদ্যকে যে প্রকারে ব্যবহার করতে পারে পরিপাক তন্ত্র খাদ্যকে সেই ধরনের পদার্থে পরিবর্তন করে।

খ) **বিশোষণ (Absorption) ঃ** যে প্রক্রিয়ায় খাদ্য পরিপাক হবার পর অন্ত্র থেকে রক্তে মিশে যায়, তাকে "বিশোষণ" বলে।

গ) **নিষ্কাশন (Excretion) ঃ** পরিপাক তন্ত্রে হজম হয় নাই এমন ধরনের খাদ্য অর্থাৎ বর্জ্য পদার্থকে শরীর থেকে বের করার প্রক্রিয়াকে "নিষ্কাশন" বলা হয়।

খাদ্যের পরিপাক, বিশোষন ও নিষ্কাশন প্রক্রিয়া ঃ

- মুখ খাদ্য গ্রহণ করে।
- ঠোঁট খাদ্যকে মুখের ভিতর ধরে রাখে।
- জিহ্বা খাদ্যকে মুখের ভিতর নাড়াচাড়া করে।
- লালা গ্রন্থি খাদ্যকে ভিজিয়ে নরম রাখে।
- দাঁত খাদ্যকে ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ করে।
- অন্ননালীর ভিতর খাবার যাবার পর ইহা পাকস্থলী পর্যন্ত বহণ করে।
- পাকস্থলীর আস্তরণ থেকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাবারকে হজম করতে সাহায্য করে।
- পানিসহ খাবারের বেশীরভাগ অংশ ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ও বিশোষণ হয়।
- বৃহদান্ত্র দেহের বর্জ্য পদার্থগুলো সংগ্রহ করে মলদ্বারের দিকে চালিত করে।
- মলদ্বার শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করে দেয়।

দেহে খাদ্য ভালভাবে পরিপাক, বিশোষণ ও নিষ্কাশন না হলে কি কি ক্ষতি হয়?

খাদ্য ভেঙ্গে পুষ্টিকর পদার্থে পরিণত না হতে পারলে দেহের কোষগুলোর বৃদ্ধিসাধন হয় না। বিশোষণ না হলে খাদ্যকে খাদ্যনালী থেকে রক্তে চালিত প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। পরিপাক তন্ত্রে হজম না হলে বদহজম

(Malabsorption) হয় এবং নিষ্কাশন কাজে বিঘ্ন ঘটলে অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) দেখা দেয়।

উদর বা পেটের গঠন

পরিপাক তন্ত্রের বেশীর ভাগ অংশ পেটের মধ্যে অবস্থিত। পেট মধ্যচ্ছেদা থেকে বস্তিকোটরের অস্থি পর্যন্ত প্রসারিত। নাভির মধ্য দিয়ে দুটি কাল্পনিক রেখা টেনে পেটকে চারটি অংশে বিভক্ত করা যায়। যার প্রত্যেকটিকে এক চতুর্থাংশ বা Quadrant বলে। এই অংশগুলো হচ্ছে উপরের ডান ও বাম চতুর্থাংশ এবং নীচের ডান ও বাম চতুর্থাংশ।

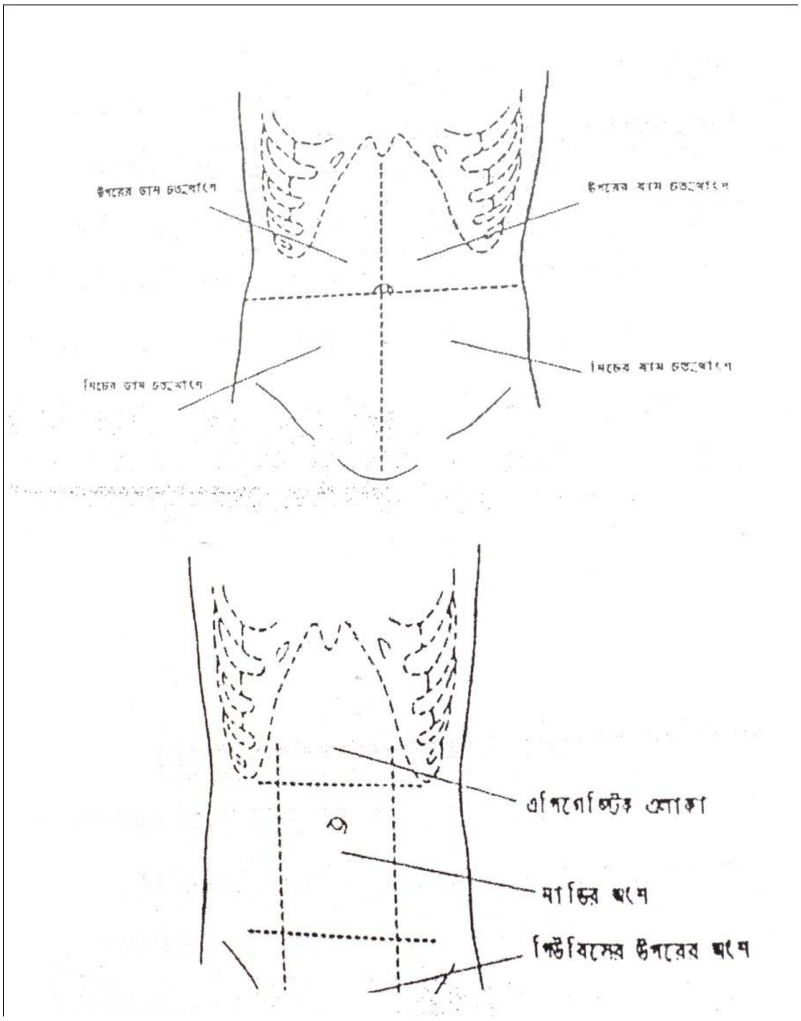

চিত্র - ৩৭ ঃ নাভীর চতুর্পাশ্বের এলাকা

পাঠ - ২১
মূত্র তন্ত্রের গঠন, কার্যাবলী, মূত্র উৎপাদন ও পরিবহন

মূত্র তন্ত্র (Urinary System)

বৃক্ক, বৃক্কনালী, মূত্রাশয় এবং মূত্রনালী নিয়ে মূত্র তন্ত্র গঠিত।

১) কিডনি (Kidney)

মানব দেহে দুটি বৃক্ক আছে। প্রতিটি বৃক্ক হাতের মুষ্টির সমান এবং পেটের পেছনের দিকে কশেরুকার উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা (T_{12} - L_3) অর্থাৎ দ্বাদশ বক্ষ কশেরুকা থেকে তৃতীয় কটি কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত। ডান বৃক্ক বাম বৃক্ক থেকে সামান্য নীচে অবস্থিত। বৃক্কই মূত্র তন্ত্রের একমাত্র অংগ যা মূত্র তৈরীতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। বৃক্ক শরীর থেকে বিষাক্ত অপ্রয়োজনীয় পদার্থ বের করে দেয় এবং শরীরে পানি ও খনিজ লবণ এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। মূত্র তন্ত্রের অন্যান্য অংগগুলো মূত্র বহন এবং সংরক্ষণ করে।

২) ইউরেটার (Ureter)

বৃক্কনালী হচ্ছে পেশীর তৈরী পাতলা নল যা বৃক্ক থেকে শুরু হয়ে মূত্রাশয়ে শেষ হয়েছে। দুটি বৃক্ক থেকে দুটি বৃক্কনালী পেটের উভয় পার্শ্ব দিয়ে নীচের দিকে নেমেছে এবং মূত্রাশয়ে যুক্ত হয়েছে। এগুলো প্রায় ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি লম্বা। বৃক্কনালী বৃক্ক থেকে মূত্রাশয়ে মূত্র বয়ে নিয়ে আসে।

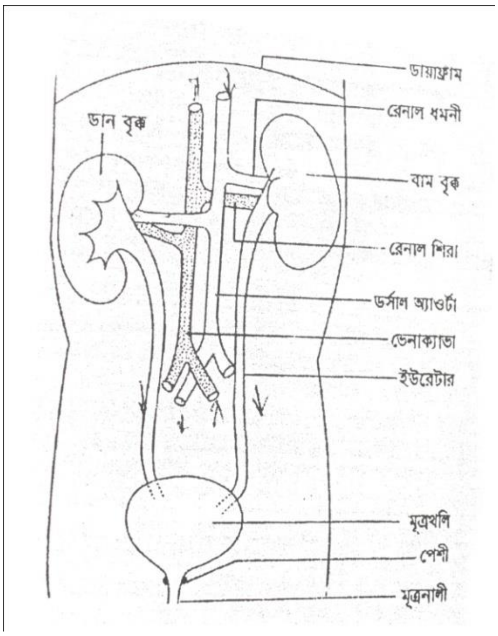

চিত্র - ৩৮ ঃ মূত্র তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

৩) ইউরিনারী ব্লাডার (Urrinary Bladder)

এটা পেশীর তৈরি একটি ভান্ডার যা আয়তন পরিবর্তন করতে পারে। ইহা বৃক্কনালীর মাধ্যমে মূত্র গ্রহণ করে এবং মূত্রনালীর মাধ্যমে শরীর থেকে মূত্র ত্যাগ করে। মূত্রাশয় বস্তি গহ্বরের সামনে এবং নীচের অংশে অবস্থিত। মহিলাদের ক্ষেত্রে ইহা যোনিপথের সামনের দেয়ালে এবং জরায়ুর সামনে অবস্থিত এবং পুরুষের শরীরে মলাশয়ের সামনে অবস্থিত। স্বাভাবিক অবস্থায় পূর্ণ বয়স্ক একজন মানুষের মূত্রাশয়ের ধারণ ক্ষমতা ৫০০ মিলি (প্রায় আধা সের)।

৪) ইউরেথ্রা (Urethra)

মূত্র ত্যাগ করার জন্য ইহা একটি নল, যা মূত্রাশয় থেকে বাহির পর্যন্ত প্রসারিত। মহিলাদের বেলায় মূত্রনালীর রন্ধ্র (Urethral Orifice) যোনিপথের প্রবেশের পথ এবং ভগাংকুরের (Clitoris) মাঝে অবস্থিত। পুরুষের ক্ষেত্রে মূত্রনালী লিংগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে লিংগের মাথায় এসে শেষ হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে মূত্রনালী মূত্র এবং বীর্য উভয়ই নির্গত হওয়ার পথ হিসাবে কাজ করে। পুরুষ মূত্রনালী প্রায় ৮ ইঞ্চি (২০ সেঃমিঃ) লম্বা এবং মহিলা মূত্রনালী প্রায় দেড় ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি (৩.৭৫ - ৫ সেঃমি) লম্বা। কিন্তু মহিলা মূত্রনালী পুরুষের মূত্রনালীর চেয়ে অনেক প্রশস্ত। এ দুটো কারণে মূত্রনালীর সংক্রমণ মহিলাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশী দেখা যায়। মূত্রনালী বন্ধ হয়ে মূত্র বের হতে না পারলে ক্যাথেটার (Catheter) মূত্রনালী পথে ঢুকায়ে মূত্র নির্গমনের ব্যবস্থা ব্যবস্থা করা যায়।

মূত্রতন্ত্রের কার্যাবলী

দেহের কোষগুলো বেড়ে উঠার জন্য অক্সিজেন ও খাদ্যের প্রয়োজন। অক্সিজেন ও খাদ্য ব্যবহার করার ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর পদার্থ উৎপন্ন হয়। এর একটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড যা ফুসফুসের মাধ্যমে শরীর থেকে নির্গত হয়। অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থগুলো হচ্ছে ইউরিয়া (Urea) এবং ইউরিক এসিড (Uric Acid)। যেহেতু দেহের কোষ থেকে এই সব দূষিত পদার্থ রক্তে আসে, মূত্রতন্ত্র এগুলো শরীর থেকে বের করে দেয়ার দায়িত্ব পালন করে।

পাঠ - ২২
পেলভিস

পেলভিস (Pelvis)

পেলভিস পেটের সবচেয়ে নীচের অংশ। ইহা চারিদিকে হাড় দিয়ে তৈরী একটি বেলুনাকার গহ্বর। উপরের প্রান্তে পেটের দিকে খোলা। নীচের প্রান্ত একটি পেশীর পাতলা আবরণ (Perineum) দিয়ে ঢাকা যার মধ্য দিয়ে বহির্জনেন্দ্রিয় (External genital organs) ঝোলানো অবস্থায় থাকে।

পেলভিস-এর অস্থিসমূহ

পেলভিস চারটি হাড় (Bone) দিয়ে গঠিত। এগুলো হলো দুটি হিপ বোন (Hip bone), স্যকরাম (Sacrum) এবং ককসিক্স (Coccyx)। হিপ বোনের তিনটি অংশ রয়েছে। যথা- ইলিয়াম (Ilium), ইশ্চিয়াম (Ischium) এবং পিউবিস (Pubis)।

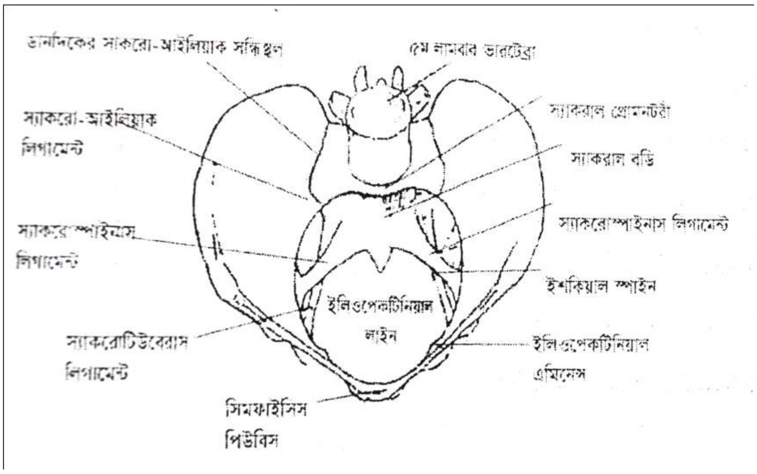

চিত্র - ৩৯ ঃ স্বাভাবিক পেলভিসের গঠন

ইলিয়াম হচ্ছে চ্যাপ্টা ধরণের বড় অংশ। সামনের দিকের গর্তের পৃষ্টদেশকে ইলিয়াক ফোসা বা গর্ত (Iliac fossa) বলে। উপরের বক্র কিনারাকে ইলিয়াক ক্রেষ্ট (Iliac crest) বলে। ইহার দুই প্রান্তকে সামনে উপরের এবং পেছনে উপরের ইলিয়াক স্পাইন (Anterior superior and Posterior superior iliac spine) বলা হয়।

ইশ্চিয়াম (Ischium) হচ্ছে হিপ বোনের হাড়ের সবচেয়ে নীচের অংশ এবং বসা অবস্থায় দেহ যে বৃহৎ প্রবর্ধিত অংশের উপর বিশ্রাম নেয় তাকে ইশ্চিয়াল টিউবারোসিটি (Ischial tuberosity) বলা হয়। এ অংশের ঠিক পেছনে এবং উপরের দিকে রয়েছে ইশ্চিয়াল স্পাইন (Ischial spine)।

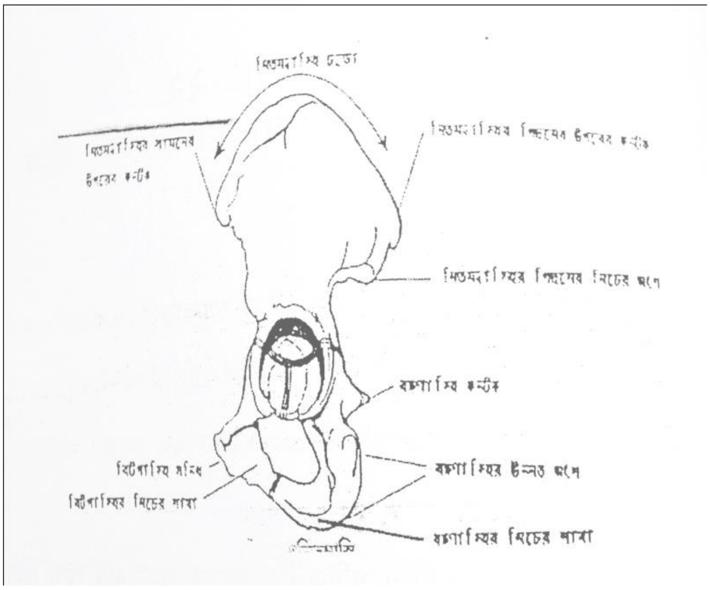

চিত্র - ৪০ ঃ হিপবোন

পিউবিস-এর (Pubis) রয়েছে একটি দেহাংশ, একটি উপরের এবং একটি নীচের শাখা। নীচের শাখা দুটো সামনের দিকে একত্র হয়ে তৈরী করেছে পিউবিক আর্চ (Pubic arch)। সিমফাইসিস পিউবিস-এ (Symphysis pubis) এই দুটো হাড় মিলিত হয়েছে।

স্যাকরাম (Sacrum) কাঠের গোঁজার মত ৫টি কশেরুকা নিয়ে গঠিত। প্রথম স্যাকরাম কশেরুকার উপরের পৃষ্ঠের কেন্দ্রকে স্যাকরাল প্রোমোনটরি (Sacral Promontory) বলা হয়।

ককসিক্স (Coccyx) হচ্ছে একটি ছোট হাড় যা চারটি ককসিক্স কশেরুকা একত্রে মিশে গিয়ে তৈরী হয়েছে। ধাত্রীবিদ্যার দৃষ্টিতে পেলভিসকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি কৃত্রিম পেলভিস (False Pelvis) এবং একটি প্রকৃত পেলভিস (True Pelvis)। প্রবেশ পথের উপরের (Brim) অংশকে কৃত্রিম পেলভিস বলা হয়। এই অংশ প্রসব প্রক্রিয়ায় কোন অংশ নেয় না। প্রকৃত পেলভিসে (True Pelvis) রয়েছে কিনারা, প্রবেশ পথ বা ঢুকার পথ এবং নীচের অংশ। ইহা পেলভিক ইনলেট (Pelvic Inlet), গহ্বর (Cavity) এবং পেলভিক আউটলেট (Pelvic Outlet) এই তিন অংশে বিভক্ত।

পেলভিক ইনলেট (Pelvic Inlet) ঃ সামনে পিবিসের উপরের অংশ, দুই পাশে ইলিয়াম ও ইশ্চিয়াম সংযোগের ফলে যে গোলাকার উঁচু জায়গার সৃষ্টি হয়েছে সেই অংশ (Iliopectineal Line) এবং পেছনে স্যাকরামের সামনের এবং উপরের স্যাকরাল প্রোমোনটরি (Sacral Promontory) নিয়ে পেলভিসের প্রবেশ পথ গঠিত হয়েছে।

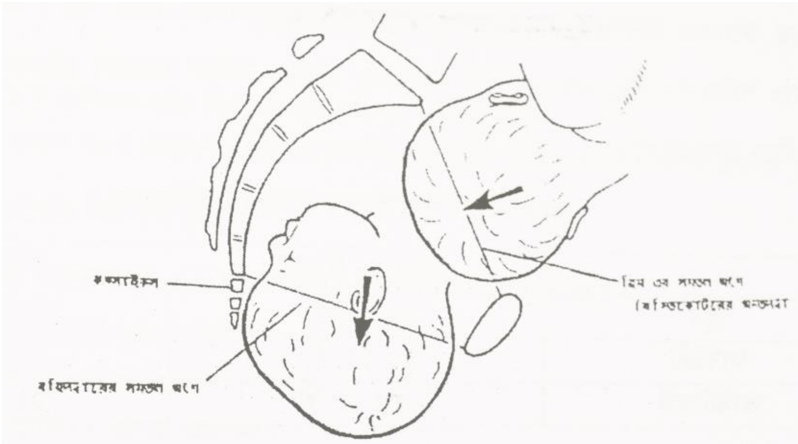

চিত্র - ৪১ ঃ পেলভিসের তল এবং ব্রিম এর সমতল অংশ

পেলভিক ক্যাভিটি (Pelvic Cavity) ঃ পেলভিসের গহ্বর অসম আকৃতির এবং সামনে পিউবিস, স্যাকরাম ও ককসিক্স এবং দুই পাশে হিপ বোনের নীচের অংশ (নিতম্বাস্থি ও বক্ষণাস্থি) দ্বারা গঠিত হয়েছে।

পেলভিক আউটলেট (Pelvic Outlet) ঃ আউটলেট কম বেশী হীরক আকৃতির (Diamond shaped)। সামনের ইশ্চিয়াম ও পিউবিসের উন্নতাংশ দ্বারা বর্হিদ্বার গঠিত হয়েছে।

স্বাভাবিক পেলভিসের পরিধি ঃ

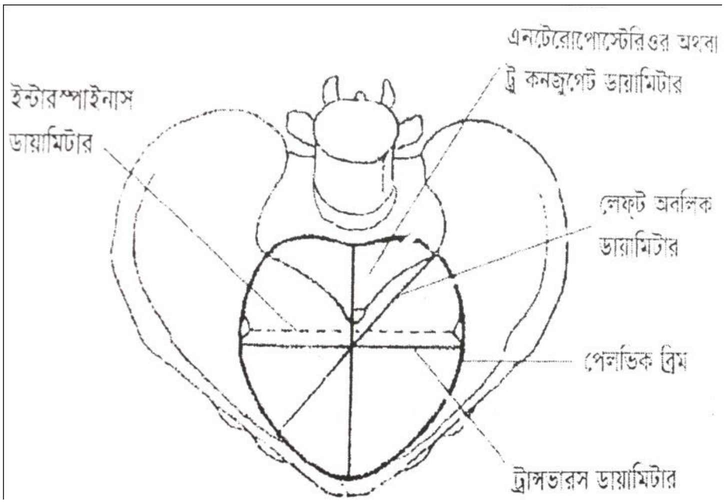

চিত্র - ৪২ ঃ স্বাভাবিক পেলভিসের পরিধি

সাধারণ পেলভিসের গড় পরিমাপ

মহিলাদের উচ্চতার ভিন্নতার সাথে সাথে পেলভিসের পরিমাপও ভিন্ন হয়। এছাড়া বিভিন্ন আকৃতির পেলভিসের পরিমাপও ভিন্ন হয়। তথাপি গড়পড়তা উচ্চতা বিশিষ্ট একজন মহিলার পেলভিসের স্বাভাবিক পরিমাপ নীচে দেয়া হলোঃ

স্বাভাবিক পেলভিসের সাধারণ পরিমাপ ঃ

	সামনে - পিছনে	আড়াআড়ি	মাঝামাঝি
ব্রিম	১১ সে.মি.	১৩.৫ সে.মি.	১২ সে.মি.
ক্যাভিটি	১২ সে.মি.	১২ সে.মি.	১২ সে.মি.
আউটলেট	১৩.৫ সে.মি.	১১ সে.মি.	১২ সে.মি.

পেলভিক ফ্লোর (Pelvic Floor)

ইহা পেশী, তক্ব, চর্বি, পর্দা (Fascia) এবং সংযোজক কলা দিয়ে তৈরী। বস্তিকোটরের তলদেশ অসম আকৃতির এবং ইহা পেলভিক আউটলেট (Pelvic Outlet) পূর্ণ করে রাখে। ভিতরের দিক থেকে বস্তিকোটরের তলদেশকে উদর গহবরের তলদেশ বুঝায়। ইহা অন্ত্রাবরক ঝিল্লী নামক একটি ঝিল্লী দ্বারা পূর্ণ থাকে। জরায়ুর মুখ, যোনিপথের উপরের অংশ, মূত্রাশয় এবং মলাশয় এখানে দৃঢ়ভাবে স্থির হয়ে আছে। এই সব অংগসমূহ সংযোজক টিস্যু দ্বারা বেষ্ঠিত এবং পেশী ও আঁশ জাতীয় টিস্যু এগুলোকে ধরে রাখে।

মূলাধার বা পেরিনিয়াম (Perineum)

যোনি ও বিটপের সন্ধিস্থান থেকে মলদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত স্থানকে পেরিনিয়াম (Perineum) বলা হয়। এই স্থানটি সংযোজক কলা, পেশী এবং চর্বি দ্বারা গঠিত ত্রিকোণাকার দলা বিশেষ। এই অংশ মলদ্বার (Anus) ও ভ্যাজাইনা (Vagina)-র নিম্ন প্রান্তে গোঁজাকার (Wedge-shaped) স্থানটি পূর্ণ করেছে এবং বস্তির তলদেশের কেন্দ্রস্থলে পেশী ও বন্ধনীগুলোকে ধরে রেখেছে।

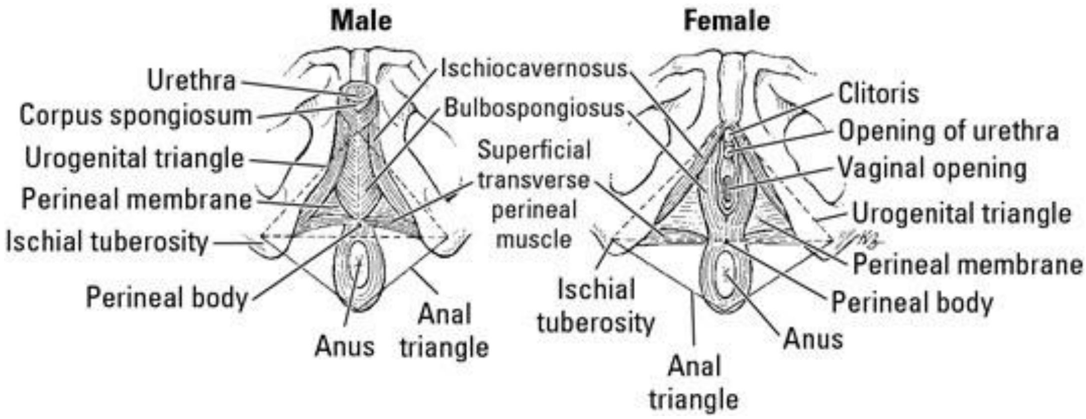

চিত্র - ৪৩ ঃ পেরিনিয়াম

পাঠ - ২৩
স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র

স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র (Female Reproductive System)

স্ত্রী দেহের যে সকল অংগ প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে তাদেরকে একত্রে স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র বলে।

স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের অংগসমূহঃ

ক) বহির্জনন অংগসমূহ (External genital organs)

১) মন্‌স পিউবিস (Mons pubis)

২) ল্যাবিয়া মেজোরা (Labia majora)

৩) ল্যাবিয়া মাইনোরা (Labia minora)

৪) ক্লাইটোরিস (Clitoris)

৫) ভেস্টিবুল (Vestibule)

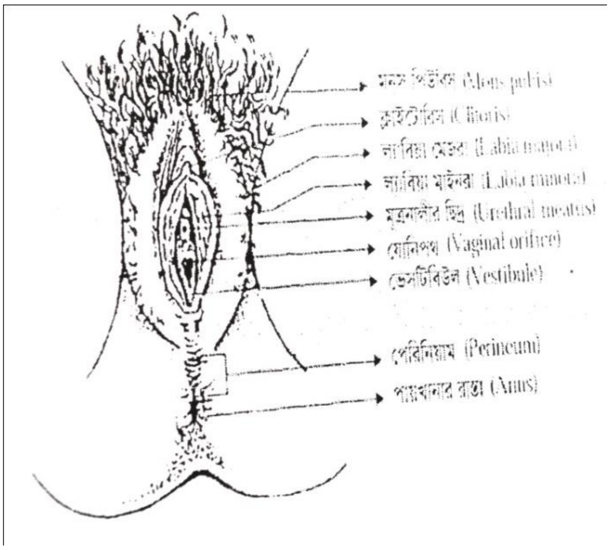

চিত্র - ৪৪ ঃ স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের বহিরাংশ

১) মন্‌স পিউবিস (Mons pubis)

এটি বর্হিজনেনদ্রিয়ের সবচেয়ে সামনের অংশ। এটা পিউবিক হাড় (Pubic bone) ঢেকে থাকা এক স্তর চর্বি। যৌবন প্রাপ্ত হলে এ অংশটি লোম দিয়ে ঢেকে যায়।

২) ল্যাবিয়া মেজোরা (Labia majora)

ল্যাবিয়া মেজোরা যোনির উভয় পার্শ্বে অবস্থিত এবং চামড়ার তৈরী ঠোঁটের মত। ইহা মন্‌স পিউবিস থেকে শুরু হয়ে নীচের দিকে এবং পেছনের দিকে গিয়ে পেরিনিয়ামে শেষ হয়েছে। ল্যাবিয়া মেজোরায় চর্বি জাতীয় টিস্যু থাকে। যৌবনপ্রাপ্ত হলে এর ত্বক লোমে আবৃত হয়ে যায়। এতে গ্রন্থি থাকে যা থেকে ঘাম ও তৈল বের হয় এবং ত্বককে কোমল রাখে।

৩) লাবিয়া মাইনোরা (Labia minora)

এগুলো হচ্ছে ল্যাবিয়া মেজোরা ও সতীচ্ছদের (Hymen) মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত ত্বকের দুটো ভাঁজ। ভেতরের পৃষ্ঠ দুটো সাধারণতঃ একে অপরের সাথে লেগে থাকে। এগুলো যোনিদ্বারকে আচ্ছাদিত করে রাখে। সামনের দিকে দুভাগ হয়ে এগুলো ক্লাইটোরিসকে ঘিরে রাখে। ছোটদের বেলায় এই অংশটি ল্যাবিয়া মেজোরার নীচে অদৃশ্য অবস্থায় থাকে।

৪) ক্লাইটোরিস (Clitoris)

এটি একটি ক্ষুদ্র সোজা বস্তু। এটি যোনি মুখের সামনের সংযোগ স্থলে অবস্থিত এবং ল্যাবিয়া মাইনোরা দ্বারা আংশিকভাবে লুকানো থাকে। এর সাথে বিভিন্ন ভাবে পুরুষ লিংগের সামঞ্জস্য আছে। যৌন উত্তেজনার ফলে এটি খাঁড়া বা বড় হয়ে যায়।

৫) ভেস্টিবুল (Vestibule)

ইহা দুটো ল্যাবিয়া মাইনোরা (Labia Minora) মধ্যে একটি পথ বা মুখ।ভেস্টিবুল (Vestibule) আনুমানিক ১.৫ ইঞ্চি থেকে ২ ইঞ্চি লম্বা (৩.৭৫ সে.মি. থেকে ৫ সে.মি.) এবং ল্যাবিয়া মাইনোরা দুটো পৃথক হলে সবচেয়ে প্রসারিত জায়গা ১ ইঞ্চি চওড়া। ভেস্টিবুলের তিনটি প্রধান অংগের ছিদ্র রয়েছে। যথাঃ

- **মূত্রনালীর ছিদ্র (Urethral Orifice)** ঃ এ ছিদ্রের সামনের দিকে থাকে ক্লাইটোরিস (Clitoris) এবং পিছনের দিকে থাকে যোনিপথ (Vagina)।
- **যোনিপথের ছিদ্র** ঃ একটি অসম্পূর্ণ পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে যাকে সতীচ্ছদ (Hymen) বলা হয়। এ ছিদ্রের সামনের দিকে থাকে মূত্রনালীর ছিদ্র।
- **বার্থোলিন নলের ছিদ্র** ঃ ভেস্টিবুলের (Vestibule) প্রতি পাশে বার্থোলিন গ্রন্থির (Bartholin glands) নলের ছিদ্রের মুখ রয়েছে। বার্থোলিন গ্রন্থি হচ্ছে ক্ষুদ্রাকার শ্লেষ্মা নিঃসরণকারী গ্রন্থি।
-

বহিঃযৌনাঙ্গের কাজ

- ল্যাবিয়া মেজোরা ও ল্যাবিয়া মাইনোরা ভ্যাজাইনাকে ঢেকে রাখে।
- বার্থোলিন গ্রন্থির নিঃসরন যৌন মিলনের সময় ভ্যাজাইনাকে পিচ্ছিল করে
- ক্লাইটোরিস যৌনমিলনকে আনন্দঘন করে তোলে।

খ) আভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ (Vestibule)

১) ভ্যাজাইনা (Vagina)

২) ইউটেরাস (Uterus)

৩) ফ্যালোপিয়ান টিউব (Fallopian tube)

৪) ওভারী (Ovary)

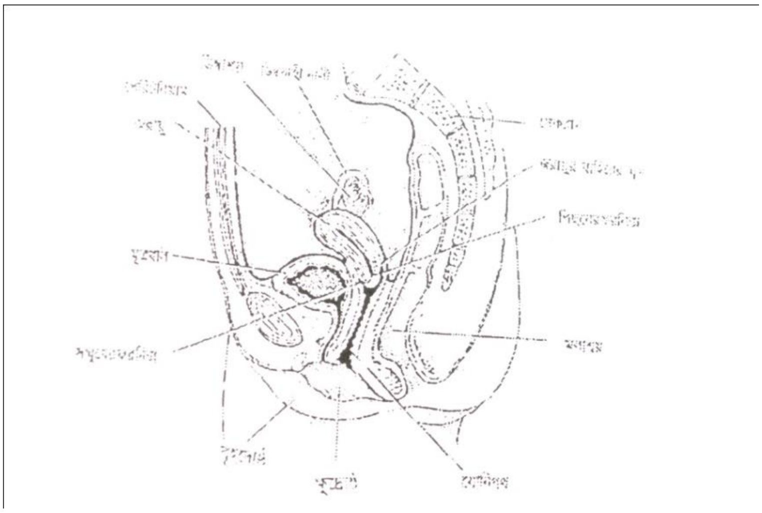

চিত্র - ৪৫ ঃ স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের ভিতরের অংশ (আড়াআড়ি কাটা)

১) ভ্যাজাইনা (Vagina)

ভ্যাজাইনা ইউটেরাসকে শরীরের বাহিরে সংযোজনকারী একটি মাংসল টিউব বা নল। ভ্যাজাইনার বাহিরের মুখ ল্যাবিয়া মাইনোরার ভাঁজের মধ্যে অবস্থিত। ইউরিনারি ব্লাডার থেকে ইউরেথ্রা শুরু হয়ে ভ্যাজাইনার সম্মুখভাগে এসে শেষ হয়েছে। ভ্যাজাইনা প্রসব পথের শেষ অংশ যার মধ্য দিয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শিশুকে অতিক্রম করতে হয়। ভ্যাজাইনার দেয়াল শ্লেষ্মা ঝিল্লি দিয়ে আবৃত। এ ঝিল্লি দেখতে ফ্যাকাশে লাল এবং ভেজা ভেজা থাকে। যৌন উত্তেজনার সময় ভ্যাজাইনায় প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয়।

ভ্যাজাইনার কাজ ঃ

ক) যৌন মিলনের সময় সঞ্চালিত বীর্য ধারণ করে।

খ) প্রসবের সময় প্রসারিত হয়ে প্রসবে সহায়তা করে।

২) ইউটেরাস (Uterus)

ইউটেরাস একটি ফাঁপা পেশী এবং একটি ডিমের চেয়ে সামান্য বড়। নীচের সরু প্রান্তকে ইউটেরাসের মুখ বলা হয় যা ভ্যাজাইনার সাথে মিশেছে। ইউটেরাসের উপরের অংশ অথবা দেহাংশ প্রতি পার্শ্বে ফ্যালোপিয়ান টিউবের সাথে যুক্ত হয়েছে।

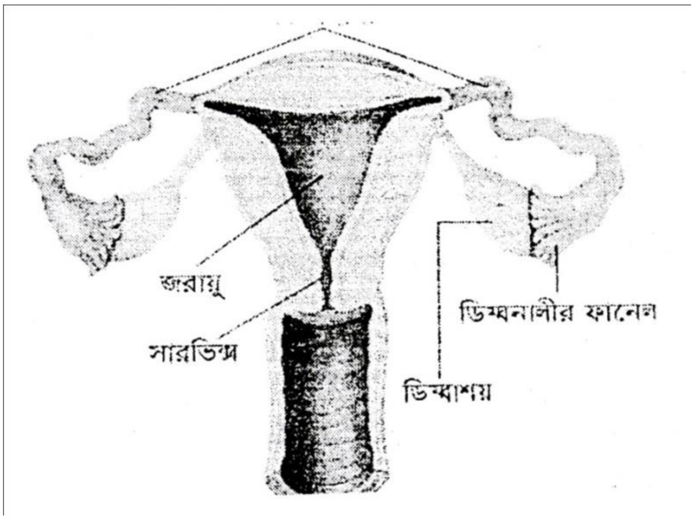

চিত্র - ৪৬ ঃ স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের ভিতরের অংশ (সম্মুখ দৃশ্য)

ইউটেরাসকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। ইউটেরাস-এর দেহ (Corpus) এবং ইউটেরাস-এর মুখ বা সারভিক্স (Cervix)। ইউটেরাস-এর গহ্বর শ্লেষ্মা ঝিল্লি দিয়ে আচ্ছাদিত যাহা ঋতুচক্রের পর্ব অনুযায়ী পরিবর্তন হয়। ইউটেরাস-এর শক্তিশালী পেশী গর্ভাবস্থায় ইউটেরাসকে সম্প্রসারিত এবং প্রসবের সময় সংকুচিত হতে সাহায্য করে। যাদের বাচ্চা হয় নাই তাদের ইউটেরাস-এর গহ্বরের দৈর্ঘ্য ইউটেরাস-এর বাহিরের মুখ (External os) থেকে ফান্ডাস পর্যন্ত প্রায় ২.৫ ইঞ্চি (৬.২৫ সে.মি)। যাদের বাচ্চা হয়েছে তাদের ইউটেরাস গহ্বর প্রায় ০.৫ ইঞ্চি বড় অর্থাৎ ৩ ইঞ্চি বা ৭.৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় জরায়ু এন্টিভার্টেড বা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে। গর্ভধারণ না হলে এন্ডোমেট্রিয়ামের ভিতরের অংশ প্রতি মাসিক চক্রে ঝরে পড়ে।

ইউটেরাস-এর কাজ-

১। ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভ্রণকে রক্ষা করে এবং ভ্রণের পুষ্টির যোগান দেয়।

২। সার্ভিক্স বা গ্রীবার মুখের নিঃসৃত রস শুক্রাণুর চলন শক্তি বৃদ্ধি করে।

৩) ফ্যালোপিয়ান টিউব (Fallopian tube)

ফ্যালোপিয়ান টিউব ইউটেরাস-এর উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দুটো ফাঁপা পেশীর নল। এই নলের মধ্য দিয়ে ওভারি থেকে ডিম্ব নির্গত হয়ে ইউটেরাসে ঢুকে। প্রতিটি নল প্রায় ৪ ইঞ্চি (১০ সে.মি.) লম্বা। এর এক প্রান্ত ইউটেরাস-এর গহ্বরের উপরের কোণে গিয়ে ঢুকেছে। অন্য প্রান্ত পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটির (Peritoneal cavity) সাথে মিশেছে। এই প্রান্ত থেকে আঙ্গুলের মত কতকগুলো অংশ বেরিয়েছে, এগুলোকে ফিমব্রিয়া (Fimbria) বলে।

ফ্যালোপিয়ান টিউবকে ৪টি অংশে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

ক) ইউটেরাস-এর অংশ (Uterine part)

খ) ইসথমাস (Isthmus)

গ) অ্যাম্পুলারী অংশ (Ampullary part) এবং

ঘ) ফিমব্রিয়ার অংশ (Fimbriated tube)।

ফ্যালোপিয়ান টিউব-এর কাজ :

১) ওভারি হতে নিষিক্ত ডিম্বাণুকে ফিমব্রিয়ার মাধ্যমে গ্রহণ করে ইউটেরাসে প্রেরণ করে।

২) শুক্রাণুর (Sparm) মাধ্যমে ডিম্বাণুর (Ovum) নিষিক্তকরণ ফ্যালোপিয়ান টিউবে সম্পন্ন হয়।

৪) ওভারি (Ovary)

ওভারি দুটো চ্যাপটা জলপাই বা ডিমের মত দেখতে এবং পেটের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত। সাধারণতঃ প্রতিটি ওভারি প্রায় ১.৫ ইঞ্চি (৩.৭৫ সে.মি.) চওড়া এবং আধা ইঞ্চি (১.২৫ সে.মি.) পুরু। ওভারি ইউটেরাসের উভয় পার্শ্বে পেলভিসে অবস্থিত। ওভারি প্রজনন কোষ তৈরী করে যাকে ডিম্বাণু (Ovum) বলা হয়। ওভারি থেকে ডিম্বাণু নিঃসৃত হলে ফিমব্রিয়ার মাধ্যমে ফ্যালোপিয়ান টিউব-এর ভেতরে নিয়ে আসে।

ওভারির কাজ

১। ডিম্বানু (Ovum) উৎপন্ন করে।

২। স্ত্রী যৌন হরমোন, যেমন- ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেষ্টেরন নিঃসরণ করে।

স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের কার্যাবলী

স্ত্রী দেহের প্রজনন অঙ্গগুলো ২ ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের অঙ্গগুলো ডিম্বকোষ তৈরী করে এবং দ্বিতীয় ভাগের অঙ্গগুলো গর্ভস্থ শিশুর শুরু থেকে প্রসব পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ওভুলেশন (Ovulation) কি?

ওভারি থেকে পরিপক্ক ডিম্ব (Ovum) নির্গত হওয়াকে ওভুলেশন বলা হয়। দুটো ওভারি থেকে প্রতি মাসে একবার করে পর্যায়ক্রমে ডিম্ব নির্গত হয়।

ফার্টিলাইজেশন (Fertilization) কি?

ফ্যালোপিয়ান টিউব-এ শুক্রকীট ও পরিপক্ক ডিম্বের একত্রিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ফার্টিলাইজেশন (Fertilization) বলে। ইউটেরাস প্রতি মাসে নিষিক্ত ডিম্ব গ্রহণ করার জন্য আস্তরণ তৈরি করে। ফার্টিলাইজেশন প্রক্রিয়া ফ্যালোপিয়ান টিউব-এর অ্যাম্পুলারী অংশে ঘটে থাকে। এই নিষিক্ত ডিম্বানুকে জাইগোট (Zygot) বলে। ওভারি থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বানু বা ডিম্ব (Ovum) নির্গত হয় যা খালি চোখে দেখা যায় না। দুটো ওভারি থেকে প্রতিমাসে একবার করে পর্যায়ক্রমে ডিম্ব নির্গত হয় অর্থাৎ কোন এক মাসে এক পাশের ওভারি থেকে ডিম্ব নির্গত হলে, পরের মাসে অন্য পাশের ওভারি ডিম্বাশয় থেকে ডিম্ব নির্গত হয়।

ফ্যালোপিয়ান টিউব-এর অগ্রভাগে আংগুলের মতো প্রান্তটি (Fimbriated part) ডিম্বকে ফ্যালোপিয়ান টিউব-এ টেনে নিয়ে আসে। অতঃপর ডিম্বটি নালী বেয়ে ইউটেরাসে চলে আসে। যৌন মিলনের ফলে ভ্যাজাইনাতে যে সব শুক্রকীট নির্গত হয় সেগুলো ইউটেরাস দিয়ে বেয়ে ফ্যালোপিয়ান টিউব-এ যায়। তখন ডিম্ব নালীতে ডিম্ব এবং শুক্রকীট একত্র হয় তখন এ প্রক্রিয়াকে ফার্টিলাইজেশন (Fertilization) বলা হয়। কয়েকদিন পর এই নিষিক্ত ডিম্বটি ফ্যালোপিয়ান টিউব দিয়ে ইউটেরাসে নেমে আসে এবং ইউটেরাসের দেয়ালে লেগে থাকে। ইউটেরাস এই নিষিক্ত ডিম্বকে রক্ষণাবেক্ষণ করে।

ইউটেরাসে ইহা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ৯ মাসে ইহা একটি পরিপক্ক গর্ভস্থ শিশুতে (Fetus) পরিণত হয়। বেড়ে উঠা গর্ভস্থ শিশুটি যে অঙ্গের মাধ্যমে পুষ্টি পায় তাকে প্লাসেন্টা (Placenta) বলা হয়। প্লাসেন্টা ইউটেরাসের আস্তরণ এবং গর্ভস্থ শিশুর কিছু অংশ থেকে তৈরী হয়। ইউটেরাস প্রতি মাসে নিষিক্ত ডিম্ব গ্রহণ করার জন্য এর ভেতরের দেয়ালে আস্তরণ তৈরী করে। যদি ডিম্ব নিষিক্ত না হয় তবে ইউটেরাস-এর আস্তরণ ঝরে যায়। একে ঋতুস্রাব বা মাসিক (Menstruation) বলা হয়। ঋতুস্রাব সাধারণতঃ ডিম্বক্ষরণের (Ovulation) চৌদ্দ দিন পর শুরু হয়। ওভারি থেকে ডিম্ব নির্গত হওয়াকে ওভুলেশন (Ovulation) বলা হয়। একটি ঋতুস্রাব শুরু হওয়া থেকে পরবর্তী মাসের ঋতুস্রাব শুরু হওয়া পর্যন্ত সময়কে ঋতু চক্র বা মাসিক চক্র (Menstrual Cycle) বলা হয়। মাসিক চক্র গড়ে ২৮ দিনের হয়ে থাকে। কিন্তু ইহা ২৫ থেকে ৩১ দিন পর্যন্তও হতে পারে। যতদিন পর্যন্ত একজন মহিলার ঋতুস্রাব হয় ততদিন পর্যন্ত সে মহিলা গর্ভবর্তী হতে পারে। আমাদের দেশে মহিলাদের সাধারণঃ ৪৫-৪৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত ঋতুস্রাব হয়ে থাকে।

পাঠ - ২৪
হরমোন এবং স্ত্রী হরমোনসমূহের নাম ও কার্যাবলী

হরমোন (Hormone)

এনডোক্রাইন গ্ল্যান্ড (Endocrine gland) বা নালীবিহীন গ্ল্যান্ড হতে যে রস সরাসরি রক্তে নিঃসৃত হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে হরমোন (Hormone) বলে।

এনজাইম (Enzyme)

এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড (Exocrine gland) হতে যে রস নিঃসৃত হয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকলাপ সম্পন্ন করে, তাকে এনজাইম (Enzyme) বলে। পরিপাক তন্ত্রের বিভিন্ন এনজাইম, যেমন- পেপসিন, লাইপেজ ইত্যাদি নির্গত হয়ে খাবারকে হজম করতে সহায়তা করে।

ওভারি ঃ ডিম্বানু উৎপন্ন করা ছাড়াও স্ত্রী হরমোন তৈরী করার কাজ করে।

স্ত্রী হরমোনসমূহ ঃ স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের প্রধান দুটো হরমোনের নাম হলোঃ

১। ইস্ট্রোজেন (Oestrogen)

২। প্রোজেস্টেরন (Progesterone)

ইস্ট্রোজেন ঃ ওভারি ইস্ট্রোজেন হরমোন তৈরী করে যা প্রতি মাসে ডিম্বাণুর পরিবর্ধন এবং মাসিক ঋতুচক্রের পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে। ইস্ট্রোজেন এর আরও একটি কাজ হচ্ছে স্ত্রী যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহের বিকাশ ঘটানো। ১০ থেকে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে হরমোন তৈরী শুরু হয় যা ৪৫ থেকে ৫০ বৎসর বয়সে গিয়ে কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়।

প্রোজেস্টেরন ঃ ইহা ওভারি এবং প্লাসেন্টা থেকে নিঃসৃত হয়। ১০ থেকে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে হরমোন তৈরী শুরু হয় যা ৪৫ থেকে ৫০ বৎসর বয়সে গিয়ে কমে যায় বা বন্ধ হয়। প্রোজেস্টেরন ইউটেরাসের গর্ভাবস্থা রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করে। এছাড়া স্তনের দুগ্ধ উৎপাদনকারী গ্রন্থি এবং স্তনের লবিউল সমূহের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

পাঠ - ২৫

ঋতু চক্র ও ঋতু স্রাব

ঋতু চক্র (Menstrual Cycle) কি?

বয়ঃপ্রাপ্ত নারীর প্রজনন কালে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ঋতুস্রাব হয়ে থাকে। একটি ঋতুস্রাব শুরু হওয়া থেকে পরবর্তী মাসের ঋতুস্রাব শুরু হওয়া পর্যন্ত সময়কে ঋতুচক্র বা মাসিক চক্র বলে। ঋতুচক্রের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ২৮ দিন। তবে ইহা ২৫ থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত হতে পারে।

ঋতু স্রাব (Menstruation) কাকে বলে?

ইউটেরাস প্রতি মাসে নিষিক্ত ডিম্ব গ্রহণ করার জন্য আস্তরন তৈরী করে। যখন নিষিক্ত না হয় তখন ইউটেরাস-এর আস্তরণ ঝরে যায়। প্রতি মাসে ভ্যাজাইনা দিয়ে ঝরে যাওয়া এই রক্ত স্রাবকে ঋতু স্রাব বা মাসিক বলা হয়। ভ্যাজাইনার এই রক্ত স্রাব সাধারণত ঃ ৩ থেকে ৫ দিন স্থায়ী হয়।

ঋতু স্রাবের রক্তের উপাদান

- অনিষিক্ত ডিম্বানু
- রক্ত
- শ্লেষ্মা
- শ্বেত কণিকা
- প্রোষ্টাগ্লান্ডিন
- ইউটেরাস-এর ভেতরের আস্তরনের ধ্বংস প্রাপ্ত টিস্যু
- ফিব্রিনোলাইসিন।

ঋতু স্রাব কখন শুরু ও শেষ হয়?

১০ থেকে ১৩ বৎসর বয়সের সময় ওভারি হরমোন তৈরী শুরু করে যার ফলে ঋতু স্রাব শুরু হয়। ইহা প্রায় ৪৫-৪৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত চলতে থাকে। স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের ২টি প্রধান হরমোন ইষ্ট্রোজেন এবং প্রোজেষ্টরন ঋতু স্রাবকে প্রভাবিত করে।

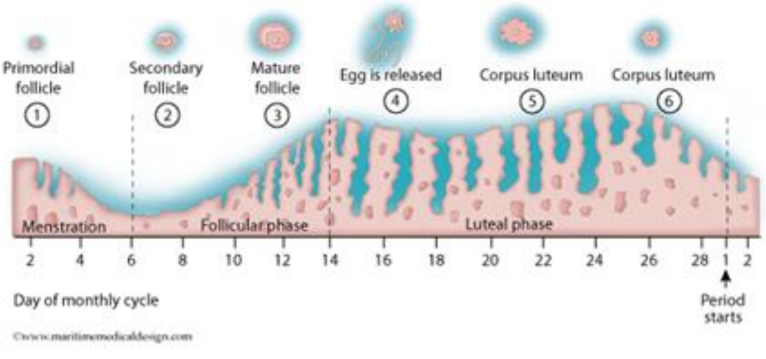

চিত্র - ৪৭ ঃ ঋতুচক্র

পাঠ - ২৬
পিউবার্টি, মেনার্কি ও মেনোপজ

পিউবার্টি (Puberty) কি?

স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র থেকে দুটো প্রধান হরমোন ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন নিঃসৃত হয় যার দ্বারা একটি মেয়ের ১০ থেকে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এ পরিবর্তনকে যৌবন আরম্ভ বা পিউবার্টি বলে।

পিউবার্টিতে শরীরে কি কি পরিবর্তন দেখা দেয়?

- ওভারিতে প্রচুর পরিমাণে হরমোন তৈরী হয়
- ওভারি পরিপক্ক হয়
- ঋতু স্রাব শুরু হয় (মেনার্কি)
- মন্‌স পিউবিস-এ ও বগলে লোম/চুল উঠা শুরু হয়
- স্তনদ্বয় বড় হতে থাকে
- বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আগ্রহ বা ঝোঁক বৃদ্ধি পায়।

কোন বয়সে পিউবার্টি আরম্ভ হয়?

মোটামুটিভাবে ১০ থেকে ১৩ বৎসর বয়সে পিউবার্টি বা যৌবন আরম্ভ হয়।

মেনারকি (Menarche) কাকে বলে?

যৌবন আরম্ভের পর সর্ব প্রথম ঋতুস্রাব হওয়াকে মেনার্কি (Menarche) বলে। সাধারণতঃ ১০ থেকে ১৩ বৎসর বয়সের মধ্যে মেনারকি বা সর্বপ্রথম ঋতুস্রাব হয়।

মেনোপজ (Menopause) কাকে বলে?

একজন মহিলার প্রজনন কালের (Reproductive Period) শেষের দিকে শরীরে যখন ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেষ্ট্রোজেন তৈরী হওয়া কমতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তাঁর ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থাকে মেনোপজ (Menopause) বলে। সাধারণতঃ ৪৫ থেকে ৪৯ বৎসর বয়সের মধ্যে একজন মহিলার মাসিক বন্ধ হয়ে যায়।

মেনোপজের সময় যে সব শারিরীক পরিবর্তন হয় ঃ মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা, অস্বস্তিকর গরম অনুভব করা, খিট খিটে মেজাজ, হাত-পা জ্বালাপোড়া করা, ভ্যাজাইনা শুকনো থাকা, যৌন সহবাসে ব্যথা অনুভব করা, ঘুম কমে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি।

পাঠ - ২৮
স্তন ঃ গঠন ও কার্যাবলী

স্তনের গঠন

স্তন বা স্তনগ্রন্থিদ্বয় চেস্টের সামনের দিকে এবং উপরিভাগে অবস্থিত। ১৫ থেকে ২০টি লোব-এর (Lobes) সমন্বয়ে ইহা গঠিত হয়েছে যা থেকে দুধ তৈরী হয়। শক্ত আঁশযুক্ত টিস্যু দ্বারা লোবগুলো পৃথক থাকে। প্রতিটি লোব একটি ল্যাকটিফেরাস ডাক্ট (Lactiferous Duct)-এ দুধ নিঃসৃত করে এবং নলটি স্তনের নিপল-এ এসে শেষ হয়েছে। স্তনের নিপল (Nipple) চারপাশের কালো চামড়াকে এ্যারিওলা (Areola) বলে। স্তনে তিন ধরনের টিস্যু বা কলা থাকে। যথা- (ক) গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু (খ) ফাইব্রাস টিস্যু এবং (গ) ফ্যাটি টিস্যু।

গ্ল্যান্ডুলার টিস্যু

এ টিস্যু ১৫-২০টি লোব তৈরী করে। প্রতিটি লোব একটি ল্যাকটিফেরাস ডাক্ট-এ দুগ্ধ নিঃসৃত করে। নালীগুলো নিপল-এ এসে শেষ হয়। এ্যারিওলার নীচের পৃষ্ঠে এসে প্রতিটি নালী প্রসারিত হয়ে ল্যাকটিফেরাস সাইনাস (Lactiferous Sinus) তৈরী করে যেখানে দুধ এসে জমতে থাকে।

ফাইব্রাস টিস্যু

ফাইব্রাস টিস্যুর জন্য চামড়ার নীচে স্তনের গ্ল্যান্ডগুলো ঝুলে থাকতে পারে। স্তনে কোন মাংস পেশী থাকে না।

ফ্যাটি টিস্যু

সমস্ত স্তনপৃষ্ঠ ফ্যাটি টিস্যু দ্বারা পূর্ণ থাকে। এর জন্যই স্তনদ্বয় নরম তুলতুলে এবং গোলাকৃতি হয়ে থাকে। নিপল এবং এ্যারিওলা কোন চর্বি বা ফ্যাট থাকে না।

কিভাবে বুকের দুধ তৈরী হয়

প্রসবের পর পরই বুকের দুধ তৈরী শুরু হয়। গর্ভাবস্থায় শেষ পর্যায়ে প্রোল্যাক্টিনের (Prolactin) প্রভাবে স্তনে কিছু দুধ (শালদুধ) তৈরী হয়ে মজুদ থাকে। জন্মের পর বাচ্চা দুধ খাওয়া শুরু করলে তা বের হয়ে আসে। জন্মের ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে দুধের উপাদানের পরিবর্তন হয় এবং পরিণত দুধ পর্যাপ্ত পরিমানে তৈরী শুরু হয়। জন্মের পর শিশু যখন মায়ের বুকের দুধ চোষে তখন স্তনের বোটা থেকে স্নায়ুর মাধ্যমে পিটুইটারী গ্রন্থির সামনের অংশ উদ্দিপীত হয়। ফলে প্রোল্যাক্টিন (Prolactin) নামের হরমোন আরও বেশী

নিঃসরিত হয় যা বুকের দুধ তৈরী করে। সেই কারনে পর্যন্ত বুকের দুধ তৈরীর জন্য শিশুকে বারে বারে বুকের দুধ চোষাতে হবে।

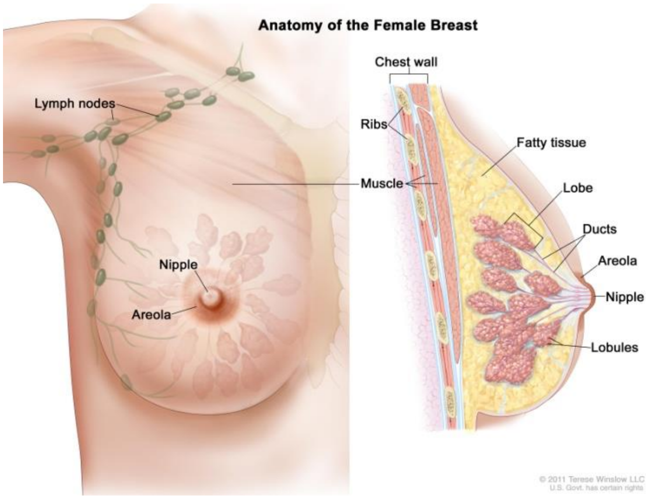

চিত্র - ৪৮ ঃ স্তনের গঠন

বুকের দুধ খাওয়ানোর শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া

গর্ভকালীন সময়ে স্তনের পরিবর্তন হবার ফলে জন্মের পর পর সুস্থ শিশুকে মায়ের বুকে দুধ চুষতে দিলে শালদুধ বের হয়। দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়ের প্রস্তুতি ও আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন যা সম্মন্ধে ধারণা গর্ভকালীন সময়ে দেয়া হয়। মা শিশুকে স্তনে লাগালে তার শরীরে কিছু উপাদান তৈরী হয় যা দুধ তৈরী ও সরবরাহ করতে সাহায্য করে। স্তনের কালো অংশ শিশুর মুখের ভিতর থাকলে এবং শিশু সঠিক অবস্থান থেকে বার বার দুধ চুষলে পর্যাপ্ত দুধ পাবে।

বুকের দুধের লেট ডাউন রিফ্লেক্স

পিটুইটারী গ্ল্যান্ড-এর পিছনের অংশ থেকে তৈরী অক্সিটোসিন (Oxytocin) হলো আরেকটি হরমোন যা বুক থেকে শিশুর মুখে দুধ নিঃসৃত করতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। স্তনের গ্ল্যান্ড ঘিরে থাকা মাংস কোষ সংকোচনের মাধ্যমে স্তনের গ্ল্যান্ড থেকে দুধ সবেগে বেরিয়ে আসে। অক্সিটোসিন এই মাংস কোষকে সংকোচনে সহায়তা করে। শিশু বুকের দুধ চুষলে অক্সিটোসিন নিঃসরিত হয়। লেট ডাউন রিফ্লেক্স কার্যকরী হয়ে দুধ নামতে প্রাথমিক অবস্থায় ২-৩ মিনিট সময় লাগে।

পাঠ - ২৮
পুরুষ প্রজনন তন্ত্র

পুরুষ প্রজনন তন্ত্র (Male Reroductive System) কি?

পুরুষ দেহের যে সকল অঙ্গ প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে একত্রে পুরুষ প্রজনন তন্ত্র বলে।

পুরুষ প্রজনন তন্ত্রের বিভিন্ন অংগ

ক) পুরুষ বর্হিজনন অঙ্গ

১। স্ক্রোটাম (Scrotum) : দুই উরুর মাঝখানে ঝুলে থাকা থলি বিশেষ। এটি শুক্রানু (Sperm) উৎপাদনের জন্য অনুকুল তাপমাত্রা বজায় রাখে এবং টেস্টিসদ্বয়কে (Testes) আঘাত থেকে রক্ষা করে।

২। পেনিস (Penis) : যৌন মিলনের সময় ইহা প্রসারিত এবং শক্ত হয়। যৌন মিলনে ইহা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বীর্য এ অংগের মাধ্যমে স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

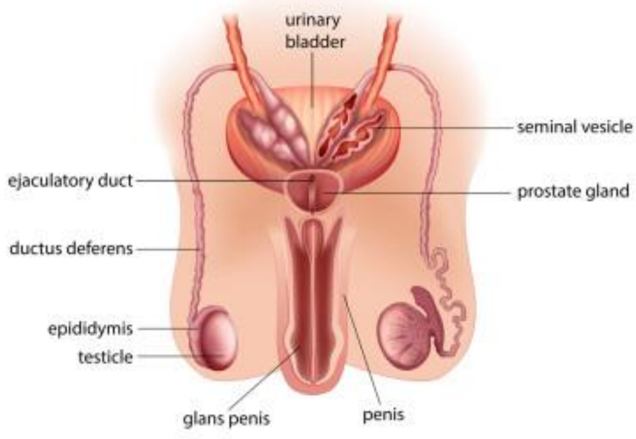

চিত্র - ৪৯ ঃ পুরুষ প্রজনন তন্ত্র

খ) পুরুষ অর্ন্তজনন অঙ্গ

১। **টেস্টিস (Testes) :** স্ক্রোটাম-এর ভেতর টেস্টিসদ্বয় পাশাপাশি অবস্থান করে এবং আকৃতিতে ডিম্বাকার। এরা শুক্রাণু উৎপন্ন করে এবং টেষ্টোষ্টেরন নামক হরমোন নিঃসরণ করে।

২। **ভাস ডিফারেন্স (Vas deferens) :** প্রতি টেস্টিস থেকে একটি নালী শুক্রাণু বহন করে। এই নালীগুলো সঙ্গমের সময় শুক্রাণু পরিবহন করে।

৩। সেমিনাল ভেসিকল (Seminal Vesicle) এবং ইজাকুলেটরি ডাক্ট (Ejaculatory Duct) : সিমেন বা বীর্য তৈরীর জন্য প্রচুর পরিমাণে ঘন পিচ্ছিল পদার্থ (Seminal fluid) নিঃসরণ করে এবং এর ফ্রুকটোজ সচল শুক্রাণুকে শক্তি প্রদান করে এবং ইজাকুলেটরি ডাক্ট-এর মাধ্যমে শুক্রনালীতে বীর্য প্রেরণ করে।

৪। প্রোষ্টেট গ্ল্যান্ড (Prostate gland) : ইহা লাটিম আকৃতির একটি ফাইব্রো-মাস্কুলো গ্ল্যান্ডুলার অরগ্যান। ইহা লেসার পেলভিসের সর্বনিম্নাংশে অবস্থিত। প্রাপ্ত বয়সে ইহার ওজন প্রায় ৮ গ্রাম।

৫। ইউরেথ্রা (Urethra) : ইহা যৌন মিলনের সময় সিমেন স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রেরণ করে।

বীর্য (Semen)

যৌন মিলনের সময় পুরুষ প্রজনন নালী হতে যে তরল পদার্থ স্খলিত হয় তাকে বীর্য বা সিমেন বলে। এটি সেমিনাল ভেসিকল, বাল্বো ইউরেথ্রাল গ্ল্যান্ড ও টেস্টিস হতে ক্ষরিত পদার্থের মিশ্রনে তৈরী হয়। বীর্যের ৮০-৯০% তরল পদার্থ এবং বাকি ১০-১২% শুক্রাণু। প্রতিবার যৌন মিলনে প্রায় ৩-৫ মি.লি. বীর্য স্খলিত হয়। এতে ২০-৩০ কোটি শুক্রাণু থাকে। এ সংখ্যার কমপক্ষে ২০% শুক্রাণু যদি স্বাভাবিক না থাকে তবে সেই পুরুষ প্রজননক্ষম নহে।

পুরুষ প্রজনন তন্ত্রের কার্যাবলী, পুরুষ হরমোন এর নাম ও কার্যাবলী

পুরুষ প্রজনন তন্ত্রের কার্যাবলী ঃ

- শুক্রকীট তৈরী করা
- শুক্রকীট সংরক্ষণ করা
- শুক্রকীট বহণ করা
- টেস্টোস্টেরন নিঃসরণ করা।

পুরুষ প্রজনন তন্ত্রের হরমোন ঃ

- টেস্টোস্টেরন।

পুরুষ হরমোন-এর কার্যাবলী ঃ

- শুক্রকীট তৈরী ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে
- পুরুষের যৌন বৈশিষ্ট্যসমূহ বৃদ্ধি করে
- যৌন ক্ষমতা সমুন্নত রাখে।

পাঠ - ২৯
এন্ডোক্রাইন তন্ত্র

এন্ডোক্রাইন তন্ত্র (Endocrine System)

পিটুইটারী গ্ল্যান্ড (Pituitary) দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত কতগুলো নালীবিহীন গ্ল্যান্ড নিয়ে এন্ডোক্রাইন তন্ত্র গঠিত হয়েছে। গ্ল্যান্ডগুলো একে অপরের সাথে সরাসরি সংযুক্ত নয় কিন্তু এক ধরণের এন্ডোক্রাইন হরমোন দ্বারা একে অপরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড হচ্ছে নালীবিহীন গ্ল্যান্ড্ যেখান থেকে হরমোন নির্গত হয়ে সরাসরি রক্তের সাথে মিশে যায় এবং দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। হরমোনগুলো তাদের উৎপত্তি স্থান থেকে কাছাকাছি এবং দুরের কলার উপর কাজ করে। নিম্নলিখিত গ্ল্যান্ড গুলো এন্ডোক্রাইন তন্ত্র (Endocrine System) এর অন্তর্ভূক্ত ঃ

১) পিটুইটারী গ্ল্যান্ড (Pituitary gland)
২) থাইরয়েড গ্ল্যান্ড (Thyroid gland)
৩) প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড (Parathyroid gland)
৪) এড্রেনাল গ্ল্যান্ড (Adrenal gland)
৫) অগ্ন্যাশয় (Pancreas)
৬) ডিম্বাশয় (Ovary)
৭) অন্ডকোষ/শুক্রাশয় (Testis)

দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশের কাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হরমোন রাসায়নিক অণুঘটক (Catalyst) হিসাবে কাজ করে। প্রতিটি হরমোনের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে। কিছু কিছু হরমোন অন্যান্য এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড-এর কাজকে প্রভাবিত করে। কিছু হরমোন দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, কিছু হরমোন দেহের বিপাক ক্রিয়াকে (Metabolism) নিয়ন্ত্রণ করে এবং কিছু হরমোন যৌন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

১) পিটুইটারী গ্ল্যান্ড (Pituitary gland) থেকে নির্গত হরমোনসমূহ

ক) গ্রোথ হরমোন (Growth hormone)
খ) গোনাডোট্রফিক হরমোন (Gonadotrophic hormone)
গ) থাইরোট্রফিক হরমোন (Thyrotropic hormone)
ঘ) এড্রেনোকর্টিকোট্রফিক হরমোন (Adrenocorticotrophic hormone)

৬) প্রোল্যাক্টিন (Prolactin) হরমোন

পিটুইটারী গ্ল্যান্ড থেকে আরও কিছু হরমোন নিঃসৃত হয়, সেগুলো হলোঃ

- অক্সিটোসিন (Oxytocin)
- এডিএইচ (Antediuretic hormone)

২। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড (Thyroid gland) থেকে নির্গত হরমোন ঃ থাইরক্সিন (Thyroxine)

৩। প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড (Parathyroid gland) থেকে নির্গত হরমোন ঃ প্যারাথ হরমোন (Parath hormone)

৪। এড্রেনাল গ্ল্যান্ড Adrenal gland) থেকে নির্গত হরমোন ঃ কর্টিসোল (Cortisol), করটিকোস্টেরন (Corticosterone), এলডোস্টেরন (Aldosterone), এনড্রোজেন (Androgen), ইস্ট্রোজেন (Oestrogen), প্রোজেস্টেরন (Progesterone) ইত্যাদি।

৫। প্যানক্রিয়াস (Pancreas) থেকে নির্গত হরমোন ঃ ইনসুলিন (Insulin) এবং গ্লুকাগোন (Glucagon)

৬। ওভারি (Ovary) থেকে নির্গত হরমোন ঃ ইস্ট্রোজেন (Oestrogen) ও প্রোজেস্টেরন (Progesterone)।

৭। টেস্টিস (Testis) থেকে নির্গত হরমোন ঃ টেস্টোস্টেরন (Testosterone)

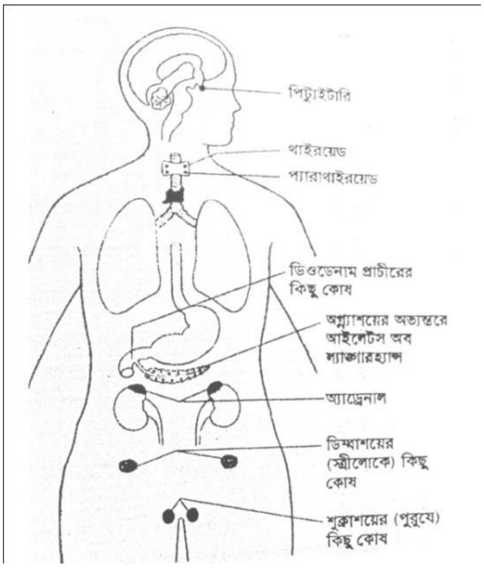

চিত্র - ৫০ ঃ স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড

এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড ও উহা থেকে নিঃসরিত হরমোনের কার্যাবলী

পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary gland)

পিটুইটারী গ্ল্যান্ড হচ্ছে প্রভু গ্ল্যান্ড (Master gland) এবং ইহা অন্যান্য গ্ল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা মগজের ঠিক নীচে এবং মাথার খুলির নীচের অংশে অবস্থিত। এই গ্ল্যান্ড-এর প্রধান হরমোনগুলো হচ্ছেঃ

ক) গ্রোথ হরমোন (Growth hormone) ঃ ইহা শরীর বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুদের শরীরে এর অভাব হলে শিশু বামন (Dwarf) হয়।

খ) গোনাডোট্রফিক হরমোন (Gonadotrophic hormone) ঃ ইহা পুরুষ ও স্ত্রী প্রজনন তন্ত্রের গঠন নিয়ন্ত্রণ করে। ঋতুস্রাবও এই হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

গ) থাইরোট্রফিক হরমোন (Thyrotrophic hormone) ঃ ইহা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড-এর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ) এড্রেনোকর্টিকোট্রফিক হরমোন (Adrenocorticotrophic hormone) ঃ ইহা এড্রেনাল গ্রন্থির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঙ) প্রোল্যাক্টিন (Prolactin) হরমোন ঃ ইহা দুধ সরবরাহের জন্য স্তনকে উত্তেজিত করে।

চ) অক্সিটোসিন (Oxytocin) ঃ প্রসবের সময় ইউটেরাসের সংকোচন করে।

ছ) এডিএইচ (ADH) ঃ কিডনি-এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীতে পুনরায় পানি বিশোষণ করে।

থাইরয়েড গ্ল্যান্ড (Thyroid gland)

ইহা গলায় স্বরযন্ত্রের ঠিক নীচে অবস্থিত। এই গ্ল্যান্ড-এর ২টি অংশ কণ্ঠনালীর দুই পাশে অবস্থিত। এই গ্ল্যান্ড-এর প্রধান হরমোন হচ্ছে থাইরক্সিন (Thyroxine)। এই হরমোন প্রস্তুত করার জন্য আয়োডিনের প্রয়োজন হয়। আয়োডিনের অভাব হলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ফুলে যায় এবং একে গলগন্ড রোগ (Goitre) বলা হয়। আয়োডিন সমৃদ্ধ মাছ বা শাক্-সবজি অথবা লবন গ্রহণ করে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এই থাইরক্সিন হরমোনের প্রধান কাজ হচ্ছে দেহের বিপাক ক্রিয়া (Metabolism) নিয়ন্ত্রণ করা। যার ফলে দেহে তাপ ও শক্তি সঞ্চার হয় এবং প্রতিটি প্রাণরক্ষক অঙ্গের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড (Parathyroid gland)

এগুলো থাইরয়েড গ্ল্যান্ড-এর পেছনে ৪টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্ল্যান্ড যা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড-এ সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। এই গ্ল্যান্ড-এর নিঃসৃত হরমোনের নাম হচ্ছে প্যারাথ হরমোন (Parath hormone)। ইহা রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং অস্থি ও দাঁতের ক্যালসিয়াম সংরক্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এড্রেনাল গ্ল্যান্ড (Adrenal gland)

ইহা প্রতিটি কিডনির চুড়ায় অবস্থিত। এজন্য ইহাকে সুপরা-রেনাল গ্ল্যান্ড (Supra-renal gland) বলা হয়। ইহা কয়েক ধরনের হরমোন তৈরী করে। যেমন- কর্টিসোল (Cortisol), করটিকোষ্টেরন (Corticosterone), এলডোষ্টেরন (Aldosterone), এনড্রোজেন (Androgen), ইস্ট্রোজেন (Oestrogen), প্রোজেষ্টেরন (Progesterone) ইত্যাদি।

দেহের প্রায় সব তন্ত্রই এড্রেনাল হরমোন দ্বারা প্রভাবিত হয়। শর্করা, পানি, মাংসপেশী, অস্থি, কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্র, পরিপাক তন্ত্র, হৃৎপিন্ড ও রক্তসংবহন নালী এবং রক্তের বিপাকের জন্য কর্টিসোল এবং কর্টিসোন অত্যন্ত জরুরী। এগুলো প্রদাহের (Inflammation) বিরুদ্ধে কাজ করে। এসব হরমোনের অপচিতিমূলক কার্যাবলী (Catabolic effect) রয়েছে। এলডোষ্টেরন (Aldosterone) হরমোন প্রধানতঃ দেহের সোডিয়াম ধরে রাখা এবং পটাসিয়াম বের করে দেয়ার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। যার ফলে দেহে পানি ও খনিজ লবনের ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়।

প্যানক্রিয়াস (Pancreas)

ইহা পাকস্থলীর পেছনে উদর গহ্বরে অবস্থিত। ইহা নরম লম্বা এবং চ্যাপটা একটি অঙ্গ। গ্ল্যান্ড-এর এন্ডোক্রাইন অংশগুলো সমস্ত প্যানক্রিয়াসে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে, যেগুলোকে “আইলেটস অফ লেংগারহানস” (Islets of Langerhan’s) বলা হয়। এগুলো ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নামক দুই ধরণের হরমোন তৈরি করে। এ দু’টো হরমোন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বা পরিমান নিয়ন্ত্রণ করে। যদি দেহে ইনসুলিন কম থাকে তবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং গ্লুকোজ অব্যবহৃত অবস্থায় প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায়, যে কারণে অতিরিক্ত প্রস্রাব হয়। ইহাকেই বহুমূত্র (Diabetes) রোগ বলা হয়। আবার দেহে গ্লুকোজের পরিমান কমে গেলে গ্লুকাগন রক্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

ওভারি (Ovary)

মহিলাদের দেহে ইহা ইস্ট্রোজেন (Oestrogen) ও প্রোজেস্টেরন (Progesterone) নামক দু’টো হরমোন তৈরী করে। হরমোন দু’টোর কার্যাবলী পাঠ-২৫ এ আলোচনা করা হয়েছে।

টেস্টিস (Testis)

টেস্টিসদ্বয় টেস্টোস্টেরন (Testosterone) নামক পুরুষ হরমোন তৈরী করে। হরমোনের কার্যাবলী পাঠ-৩০-এ ইতিমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ - ৩০
স্নায়ু তন্ত্র

স্নায়ু তন্ত্র (Nervous System)

স্নায়ুতন্ত্র হচ্ছে অন্যান্য সকল তন্ত্রের সমন্বয়কারী। অন্য কথায় বলা যায়, এই তন্ত্র অন্য সকল তন্ত্রের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে যাতে করে কোন নির্দিষ্ট কাজ সঠিকভাবে করা যায়। ইহা শুধুমাত্র ভিতরের তন্ত্রগুলোর সমন্বয় সাধন করে না, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও ইহা দেহকে সংবাদ দেয়।

স্নায়ু তন্ত্রের গঠন এবং শ্রেণী বিভাগ

স্নায়ুতন্ত্র "স্নায়ুকোষ" নামক এক ধরনের বিশেষ কোষ দ্বারা গঠিত হয়েছে। স্নায়ুকোষ (Neuron) সাধারণ কোষ থেকে ভিন্ন এবং স্নায়ু তন্ত্রের গঠন ও কার্যাবলীর একক (Unit)। স্নায়ুকোষ (Neuron)-এর ৩টি অংশ

১. Cell body, ২. Dendrite, ৩. Axon.

স্নায়ু কোষের একটি সেল বডি ও দু'টি লম্বা তারের মতো বিশেষ প্রসেস এক্সন থাকে। অন্য প্রান্তে কয়েকটি ছোট বড় তারের মত শাখা প্রশাখা থাকে এগুলোকে ডেনড্রাইট বলে। লম্বা অংশটি কয়েক ফুট পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এক্সন এর মাধ্যমে মস্তিষ্ক হতে সংবাদ বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যায়। আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংবাদ ডেনড্রাইট এর মাধ্যমে মস্তিস্কে নিয়ে আসে।

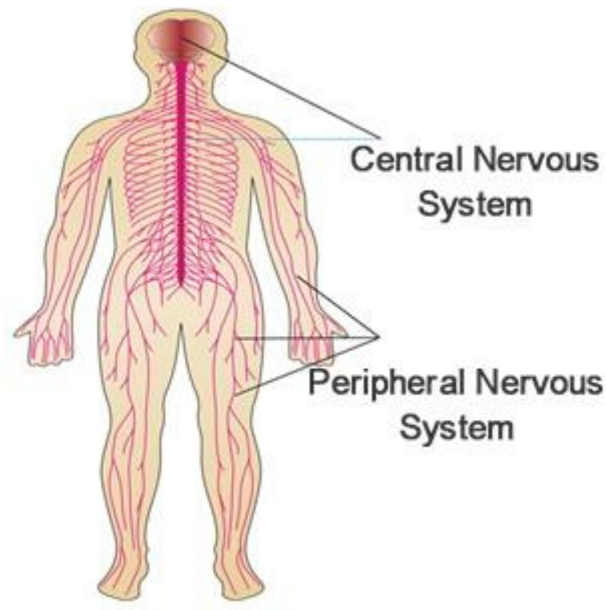

চিত্র - ৫১ ঃ স্নায়ু তন্ত্রের সাধারণ পর্যবেক্ষণ

স্নায়ু তন্ত্রকে দুটো অংশে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

১। কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্র (Central Nervous System) ঃ এর মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্ক (Brain) এবং স্পাইনাল কর্ড (Spinal Cord)।

২। **প্রান্তীয় স্নায়ু তন্ত্র** (Peripheral Nervous System) ঃ ইহা গঠিত হয়েছে মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ড থেকে আরম্ভ হওয়া স্নায়ু দিয়ে। এগুলো মস্তিষ্কে সংবাদ বহন করে নিয়ে যায় এবং মস্তিষ্ক হতে সংবাদ নিয়ে আসে।

১। কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্রের গঠন

ক) মস্তিষ্ক (Brain) ঃ মস্তিষ্ক হচ্ছে মাথার খুলির ভিতরে অবস্থিত স্নায়ু তন্ত্রের একটি বড় দলা বিশেষ। মস্তিষ্ক তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত। একটি অংশ হাটা, কথা বলা এই ধরণের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। দ্বিতীয় অংশ দেহের ভারসাম্য এবং সমন্বয় রক্ষা করে এবং তৃতীয় অংশ বিভিন্ন তন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় সাধন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। মস্তিষ্কের এ অংশ হৃৎপিন্ডের স্পন্দন, রক্ত চাপ, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, পরিপাক ও অন্যান্য তন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় কার্যাবলী সম্পাদন করে।

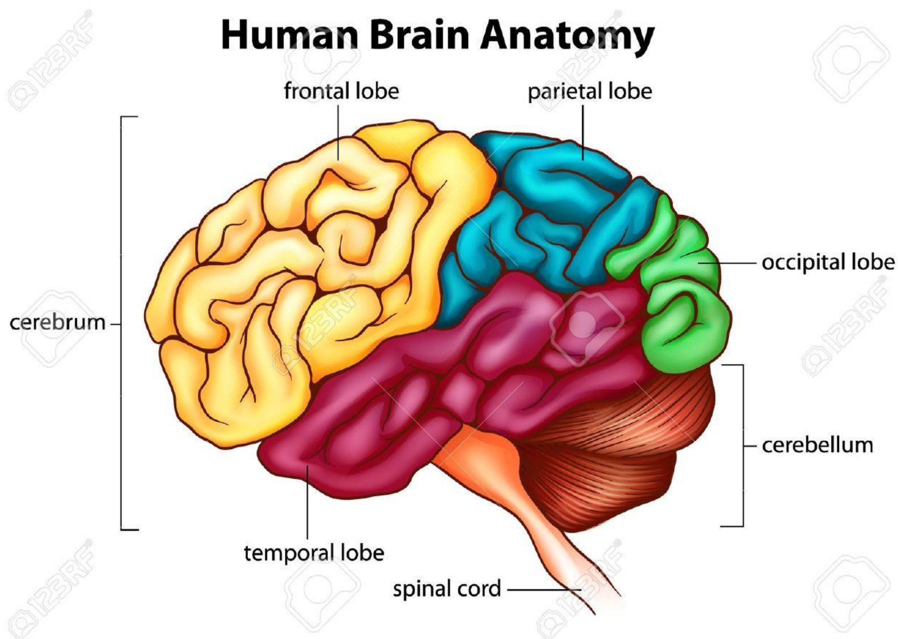

চিত্র - ৫২ ঃ মস্তিস্ক

খ) স্পাইনাল কর্ড (Spinal Cord) ঃ মস্তিষ্ক থেকে মেরুদন্ডের নীচের অংশ পর্যন্ত প্রসারিত লম্বা, সরু অংশকে স্পাইনাল কর্ড বলা হয়। স্পাইনাল কর্ড মস্তিষ্কের প্রসারিত অংশ। মেরুদন্ডের কশেরুকাগুলো স্পাইনাল কর্ডকে রক্ষা করে। মস্তিষ্কের সংবাদ স্পাইনাল কর্ড-**এর** মধ্য দিয়ে দেহের স্নায়ুতে যায়। আবার স্পাইনাল কর্ড শরীর থেকে সংবাদ মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে যায়।

মাথার খুলি এবং মেরুদন্ডের বেষ্টনী ছাড়াও মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ড এক প্রকার পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এ পর্দাকে মেনিনজেস (Meninges) বলে। মস্তিষ্কে তৈরী হওয়া তরল পদার্থ মস্তিষ্ককে আরো সংরক্ষিত করে। এ তরল মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ড-এর জন্য গদির মত কাজ করে এবং যে কোন প্রকার ঝাকুনি জনিত আঘাত হতে রক্ষা করে। এ তরল পদার্থের নাম সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড (Cerebro Spinal Fluid-CSF)। সংক্রমণ অথবা রক্তক্ষরণ হলে মস্তিষ্কে তরলের চাপ বেড়ে যেতে পারে। চাপ বৃদ্ধি পেলে মস্তিষ্কের ক্ষতি হতে পারে এবং অজ্ঞান হওয়ার কারণ হতে পারে। এ তরলের চাপ বৃদ্ধির ফলে ছোট শিশুদের মাথার তালু বা চাঁদি স্ফীত হতে পারে। স্ফীত মাথার তালু ছোট শিশুদের মারাত্মক অসুস্থতার লক্ষণ।

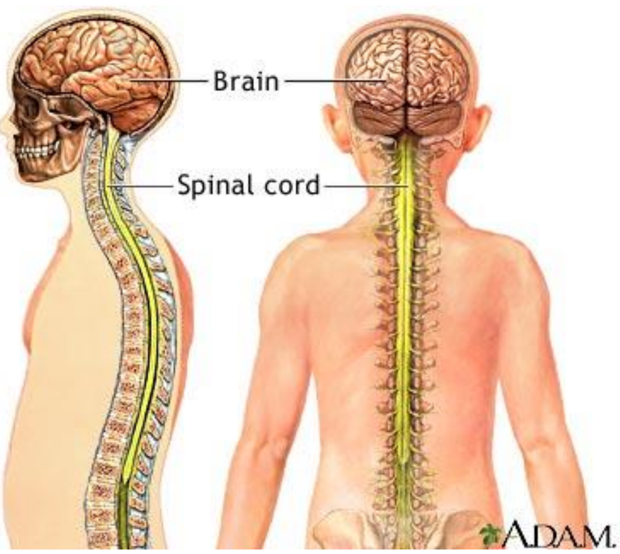

চিত্র - ৫৩ ঃ স্পাইনাল কর্ড

২) প্রান্তীয় স্নায়ু তন্ত্রের গঠন

মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ড থেকে সংবাদ বয়ে নিয়ে যাওয়া এব নিয়ে আসার জন্য যে সব স্নায়ু কাজ করে সেইগুলো প্রান্তীয় স্নায়ু তন্ত্রের অর্ন্তভূক্ত। এতে ২ ধরণের স্নায়ু রয়েছে। যথা- **ক) সেনসরি নার্ভ (Sensory Nerve)** এবং **খ) মটর নার্ভ (Motor Nerve)**।

ক) সেনসরি নার্ভ (Sensory Nerve)

দেহের ত্বক এবং অন্যান্য অংশ থেকে সেনসরি নার্ভ মস্তিষ্কে সংবাদ বহন করে নিয়ে যায়। দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই সেনসরি নার্ভ -এর প্রান্ত রয়েছে। এগুলোর কিছু ব্যথা (Pain), কিছু স্পর্শ (Touch) এব কিছু স্পন্দনের (Vibration) প্রতি সাড়া দেয়।

স্নায়ুর প্রান্ত থেকে বার্তা স্পাইনাল কর্ড-এর সেনসরি নার্ভ-এর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। যদি কোন সেনসরি নার্ভ কেটে যায় অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহলে স্নায়ুর প্রান্ত থেকে বার্তা মস্তিস্কে যেতে পারে না। ফলে শরীরের ঐ অংশে কোন প্রকার স্পর্শানুভব থাকে না।

খ) মটর নার্ভ (Motor Nerve)

মটর নার্ভ মস্তিষ্ক থেকে দেহের পেশী এবং বিভিন্ন অঙ্গে সংবাদ পৌঁছে দেয়। শক্তিবাহী স্নায়ুর এই সংবাদ মাংসপেশীকে সংকুচিত করে। শক্তিবাহী স্নায়ু মাংসপেশীর দৃঢ়তা বজায় রাখতে সাহায্য করে। পেশীর দৃঢ়তা দেহভঙ্গী সঠিক রাখে। যদি কোন মটর নার্ভকে কেটে ফেলা হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্থ হয় তখন মস্তিষ্ক থেকে পেশীতে খবর পৌঁছায় না। ফলে পেশী দূর্বল হয়ে যায় এবং মাংসপেশর দৃঢ়তা থাকে না। এই পেশী আর সংকোচন হয় না। পেশীর এই সংকোচনের ক্ষমতা হারানো এবং ফলশ্রুতিতে দেহের কোন অংশের নড়াচড়ার শক্তি হারানোকে প্যারালাইসিস (Paralysis) বা পক্ষাঘাত বলা হয়।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু তন্ত্র (Autonomic Nervous System)

এ অংশকে আবার ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র (Sympathetic Nervous System)

২। প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র (Parasympathetic Nervous System)

পাঠ - ৩১
সংবেদনবাহী অঙ্গসমূহ এবং চোখ

সংবেদনবাহী অঙ্গ (Sensory Organ)

যে সকল অঙ্গের সাহায্যে মানুষ তার পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরণ করে, সেগুলোকে সংবেদনবাহী অঙ্গ (Sensory Organ) বলে। সংবেদনবাহী অঙ্গসমূহের সাহায্যে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে অবহিত হয় ও সেই অনুযায়ী নিজেকে খাপ খাওয়ানো মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে। মানুষের প্রধানতঃ পাঁচ ধরনের সংবেদনবাহী অঙ্গ রয়েছে। যথা-

১) ত্বক (Integument/skin) ঃ ত্বক মানুষের স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

২) চক্ষু বা চোখ (Eye) ঃ চক্ষু মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়।

৩) কর্ণ বা কান (Ear) ঃ কর্ণ মানুষের শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার ইন্দ্রিয়।

৪) নাসিকা বা নাক (Nose) ঃ নাসিকা মানুষের ঘ্রাণেন্দ্রিয়

৫) জিহ্বা বা জিভ (Tongue) ঃ মানুষের স্বাদেন্দ্রিয়।

সাধারণ ভাষায় এদের একত্রে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলে।

চোখের গঠন

চোখ দৃষ্টির অঙ্গ। চোখকে স্নায়ু তন্ত্রের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। চোখ মস্তিষ্কে সংবাদ বয়ে নিয়ে যায়। মস্তিষ্কে সংবাদ পৌঁছার আগে আলোক রশ্মিকে চোখের বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। চোখ একটি গোলাকার বস্তু। ইহা মাথার খুলির একটি অস্থির গর্তের মধ্যে অবস্থিত। চোখের মাংসল আচ্ছাদনকে চোখের পাতা (Eye lid) বা চক্ষু পল্লব বলা হয়। চোখের পাতা চোখকে আঘাত থেকে রক্ষা করে। ঘন ঘন চোখের পাতা বন্ধ হওয়ার ফলে চোখ ভেজা থাকে। চোখের পাতার প্রান্তে রয়েছে সুক্ষ্ম চুল (Eye lashes)। অক্ষিপক্ষের গোড়ার দিকে ছোট ছোট গ্রন্থি থাকে। এগুলো ফুলে যেতে পারে এবং সংক্রমণ হতে পারে।

চোখের উপরের গ্রন্থি থেকে অশ্রু তৈরী হয়। চোখের পাতার পলক পরার ফলে অশ্রু চোখের সব দিক ছড়িয়ে পড়ে। অশ্রু চোখকে ভেজা এবং পরিস্কার রাখে। চোখে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি হলে বা চাপ পড়লে ঘন ঘন চোখের পলক পড়ে এবং অশ্রু বেশী উৎপন্ন হয়।

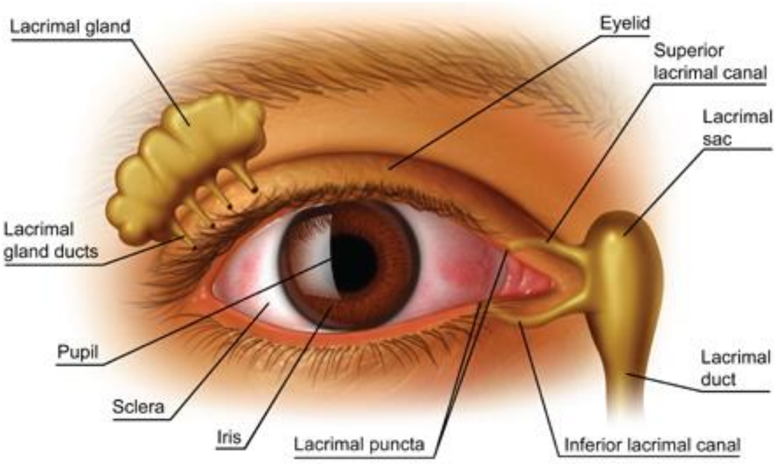

চিত্র-৫৪ ঃ চোখের গঠন (সম্মুখ চিত্র)

অক্ষিগোলকের তিনটি স্তর আছে। বাহিরের স্তরকে স্ক্লেরা (Sclera) বলা হয়। স্ক্লেরা শক্ত ও ঘন, সাদা পর্দার মত যা অক্ষিগোলককে চারদিক থেকে ঢেকে রাখে। মাঝের স্তরে রক্ত নালী থাকে। ভিতরের স্তাকে রেটিনা (Retina) বলা যায়। রেটিনা হচ্ছে বিশেষ ধরণের স্নায়ু কোষের সমন্বয়ে গঠিত যা আলোতে প্রতিক্রিয়া করে এবং তখন দেখতে পাওয়া যা। চোখের পাতা ও স্ক্লেরার সামনের অংশ যে পাতলা শ্লেস্মা ঝিল্লীর আস্তারণ থাকে তাকে কনজাংকটিভা (Conjunctiva) বলা হয়। কনজাংকটিভাতে শ্লেস্মা তৈরী হওয়ার ফলে চোখের পাতা চোখেল উপর স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। কনজাংকটিভা লাল হলে সংক্রমণ বা প্রদাহের লক্ষণ বুঝায়।

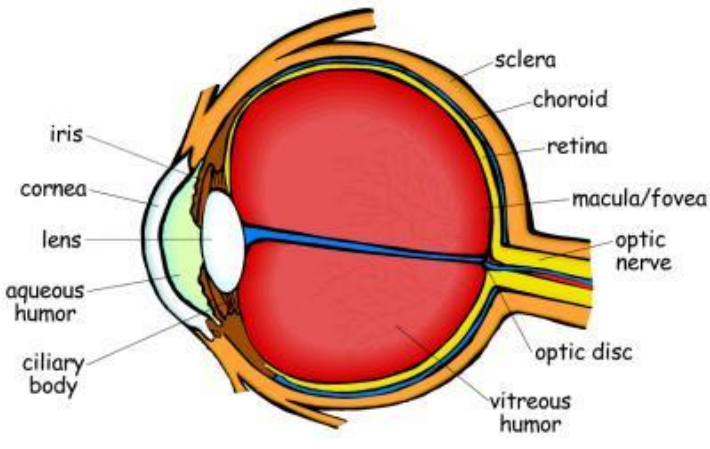

চিত্র-৫৫ ঃ চোখের লম্বচ্ছেদ

কর্ণিয়া (Cornea) ঃ

কর্ণিয়া (Cornea) হচ্ছে স্বচ্ছ টিস্যু যা চোখের সামনের অংশকে আচ্ছাদিত করে রাখে। কর্ণিয়াতে কোন রক্ত সরবরাহ থাকে না। সেজন্য কর্ণিয়াকে সুস্থ রাখতে হলে সব সময় ভেজা রাখতে হয়।

পিউপিল (Pupil) ঃ

যে ছোট গোলাকার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মি চোখের ভিতর যায় তাকে পিউপিল (Pupil) বলা হয়। আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে পিউপিল চোখের ভিতর আলো প্রবেশের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। অন্ধকারে পিউপিল খুব বড় হয়ে যায় এবং উজ্জল আলোতে পিউপিল খুব ছোট হয়ে যায়। উজ্জল আলোর প্রতি পিউপিল-এর এ প্রতিক্রিয়াকে আলোক প্রতিফলন (Light reflex) বলা হয়। পিউপিল ছোট হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে স্নায়ুর পথ সমূহ কাজ করছে। মস্তিস্কের ক্ষতিসাধন হলে তা এক বা উভয় চোখের আলোর প্রতিফলনকে প্রভাবিত করতে পারে। অসম আকৃতির পিউপিল চোখের আঘাত বা সংক্রমণের লক্ষণ।

আইরিস (Iris) ঃ

পিউপিল-এর চারপাশে যে রঙ্গিন বস্তু থাকে তাকে আইরিস (Iris) বলা হয়। এ বৃত্তাকার মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলেই পিউপিল ছোট বা বড় হয়।

লেন্স (Lens) ঃ

লেন্স (Lens) উপতারার পিছনে অবস্থিত একটি ছোট গোলাকার স্বচ্ছ টিস্যুর টুকরা বিশেষ। **লেন্স** বিভিন্ন দূরত্বের কোন জিনিষ দেখানোর জন্য নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়।

রেটিনা (Retina) ঃ

রেটিনা (Retina) চোখের পিছনের পৃষ্ঠকে ঢেকে রাখে। ইহা মৃদু আলোতে স্পর্শকাতর প্রচুর সংখ্যক রড্স্ (Rods) এবং উজ্জল আলোর প্রতি সংবেদনশীল প্রচুর সংখ্যক কোন্স (Cones) এর সমন্বয়ে গঠিত। যখন আলো এ সকল কোনস এবং রডসের উপর পরে তখন এগুলো মস্তিস্কে খবর পাঠায়। মস্তিস্ক প্রতিটি বার্তাকে অনুবাদ/ভাষান্তরিত করে যাতে করে একটি ছবি তৈরী হয়।

চোখের কার্যাবলী ঃ চোখের সাহায্যে আমরা সবকিছু দেখতে পাই। আমাদের পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু থেকে চোখ আলো সংগ্রাহ করে। আলো কর্ণিয়া এবং অক্ষিতারার মধ্য দিয়ে অক্ষিকাচে পড়ে। আলোকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য অক্ষিকাচ এর আকৃতির পরিবর্তন করে। অতঃপর আলো অক্ষিপটে পড়ে। অক্ষিপটের বিশেষ ধরনের কোষ এই আলোকে দৃষ্টি সংবাদে পরিবর্তন করে। এই সংবাদ চক্ষুর স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিস্কে যায়। মস্তিস্কের এ সংবাদ সেই বস্তুর ছবি (Image) তৈরী হয় এবং তখন দেখতে পাওয়া যায়। দেখার এ ক্ষমতাকেই দৃষ্টি শক্তি বধলা হয়। যে কোন জিনিষ আলোর গতি এবং প্রতিফলনকে যদি ব্যহত করে তবে দৃষ্টি প্রভাবিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে-কর্ণিয়া ঘোলাটে হয়ে গেলে আলো রেটিনাতে পৌঁছাতে পারে না। তখন দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

পাঠ-৩২

কান

কানের গঠন ঃ

- কান ৩টি অংশ নিয়ে গঠিত। ভেতর, মধ্য এবং বাহিরের অংশ।
- বাহিরের অংশে কানের পাতা, কানের ছিদ্রপথ এবং কানের পর্দা। কানের পাতা আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই। কানের ছিদ্রপথ সোজা নয় ইংরেজী 'S' অক্ষরের মত বাঁকা। কানের পর্দা ডিম্বাকার তরুণাস্থি দিয়ে তৈরী যার বাইরের দিক ত্বক এবং ভেতরের দিকে ঝিল্লীর আবরণ থাকে।
- কানের পর্দা কানের মধ্যের অংশকে বাইরের অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রাখে। কানের মধ্যাংশের বাইরের দেয়াল কানের পর্দা দিয়ে তৈরী। এছাড়া ছাদ, তলদেশ, পেছনের এবং ভেতরের দেয়াল পাতলা হাড় দিয়ে তৈরী।
- কানের মধ্যাংশে তিনটি ছোট ছোট হাড় থাকে। মধ্য কর্ণ থেকে ফ্যারিংস (Pharynx) পর্যন্ত একটি সরুনালী বা ইউসটেসিয়ান টিউব (Eustachean Tube) আছে। এ নালীর মাধ্যমে মধ্য কর্ণে বাতাস পৌছায়। যার ফলে বহিঃকর্ণ এবং অন্তকর্ণের বাতাসের চাপর সাম্যতা বজায় থাকে।
- কানের ভেতরের অংশ সম্পূর্ণ হাড়ের তৈরী। হাড়ের ভেতর প্যাচানো ককলিয়া (Cochlea), ভেস্টিবুল (Vestibule) এবং অর্ধবৃত্তাকার নালী (Semi-circular-canal) রয়েছে। এগুলো আমাদের কানে শোনা এবং অবস্থান বুঝতে সহায়তা করে। কানের ঠিক পেছনে ম্যাস্টয়েড (Mastoid) অস্থি থাকে। যেহেতু মস্তিস্কের কাছাকাছি সেহেতু ম্যাসটয়েড অস্থিতে সংক্রমণ হলে তা মস্তিস্কে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

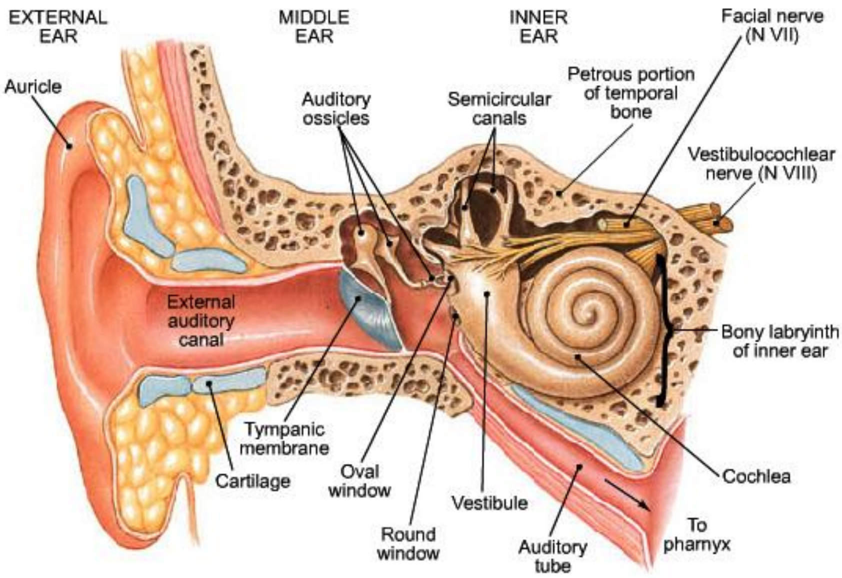

চিত্র-৫৬ ঃ কানের গঠন

কানের কার্যাবলী ঃ

কানের সাহায্যে শ্রবণ করা হয়। কান শ্রবণ বার্তা বহন করে এবং এগুলো মস্তিস্কে প্রেরণ করে। শব্দ ডেউয়ের আকারে চলে। কান শব্দের তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিণত করে যাতে মস্তিস্ক বুঝতে পারে। বাহিরের অংশ শব্দ সংগ্রহ করতে সাহায্য এবং শব্দকে কানের নালীর মাধ্যমে ভিতরে পরিচালিত করে। ঢেউ কানের নালীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত কানের পর্দাকে আঘাত করে। কম্পন মধ্যকর্ণে অবস্থিত তিনটি ছোট অস্থির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। অস্থির এ নড়াচড়া কানের ভিতরের অংশে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এ তরঙ্গ স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিস্কে পৌছায়। মস্তিস্কে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ শব্দে পরিণত হয় এবং তখন মানুষ শুনতে পায়।

কানের নালীর দেয়ালে ছোট ছোট গ্ল্যান্ডের নিঃসরণের ফলে কানের খৈল (Wax) তৈরী হয়। এছাড়া কানের নালীটি ছোট ছোট লোমে আবৃত থাকে। এ লোম কানের ময়লাকে আস্তে আস্তে ধৌত করে কানের নীচের দিক নিয়ে আসে এবং কান থেকে বের করে দেয়। ধৌত হওয়ার ফলে কান সব সময় পরিস্কার থাকে।

পাঠ-৩৩

দাঁত

দাঁত (Tooth)

দাঁত শক্ত হলেও ইহা অস্থি নয়। ইহা এক প্রকার সংযোজনী টিস্যু। স্থিতিকাল অনুসারে দাঁতকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অস্থায়ী বা দুধ দাঁত (Milk Teeth) এবং স্থায়ী দাঁত (Permanent Teeth)। মানব শিশুর যে দাঁত ৬-৭ মাস বয়স হতে আড়াই বৎসর পর্যন্ত উঠে, তাদেরকে অস্থায়ী বা দুধ দাঁত বলে। এই সময় ২০টি দাঁত উপর ও নীচের চোয়ালে শোভা পেতে আরম্ভ করে। অস্থায়ী দাঁত পড়ে গেলে যে নতুন দাঁত উঠে তাদেরকে স্থায়ী দাঁত বলে। ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে এই দাঁতের সংখ্যা হয় ২৮টি। ১৮ হতে ২৫ বৎসর বয়সের মধ্যে আরও ৪টি দাঁত উঠে, এদেরকে আক্কেল দাঁত (Wisdom Teeth) বলে। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মুখগহ্বরের প্রত্যেক চোয়ালে ১৬টি করে মোট দাঁতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩২টি। তবে অনেকের আক্কেল দাঁত কোনদিনই উঠে না।

কাজ অনুসারে দাঁতকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১) **ইনসিজর দাঁত (Incisor Teeth)** ঃ মুখের সামনের দিকে উপরের ও নীচের চোয়ালে ৪টি করে মোট ৮টি দাঁত আছে। ইহা খাদ্য দ্রব্য কেটে ছোট ছোট টুকরায় ভাঙতে সাহায্য করে।

২) ক্যানাইন দাঁত (Canine Teeth) ঃ প্রত্যেক চোয়ালে ইনসিজর দাঁত-এর দু'পার্শ্বে একটি করে মোট ৪টি ক্যানাইন দাঁত আছে। ছেদন দাঁত মাংস এবং অন্যান্য শক্ত খাদ্যদ্রব্য ছিড়ে খেতে সাহায্য করে।

৩) **প্রিমোলার দাঁত (Premolar Teeth)** ঃ উভয় চোয়ালের প্রত্যেকটি ক্যানাইন দাঁত-এর পাশে ২টি করে মোট ৮টি প্রিমোলার দাঁত থাকে এরা খাদ্যদ্রব্য চিবাতে সাহায্য করে।

৪) **মোলার দাঁত (Molar Teeth)** ঃ প্রতি চোয়ালের দুপ্রান্তে প্রিমোলার দাঁত-এর পেছনে ৩টি করে মোট ১২টি মোলার দাঁত আছে। এই দাঁতগুলো মোটা, খাট ও শক্ত। এগুলো শক্ত খাদ্যদ্রব্য পেষনে সাহায্য করে।

আদর্শ দাঁতের গঠন

একটি আদর্শ দাঁতকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায় ঃ

(১) **মুকুট (Crown)** ঃ দাঁতের চোয়ালাস্থির মাড়ির উপড়ে উদগত থাকে;

(২) **মূল (Root)** ঃ এই অংশ চোয়ালাস্থির মাড়ির গভীরে থাকে;

(৩) **গ্রীবা (Neck)** ঃ এই অংশটি মুকুট ও মূলের সংযোগস্থান।

চিত্র-৫৭ (ক) ঃ দাঁত

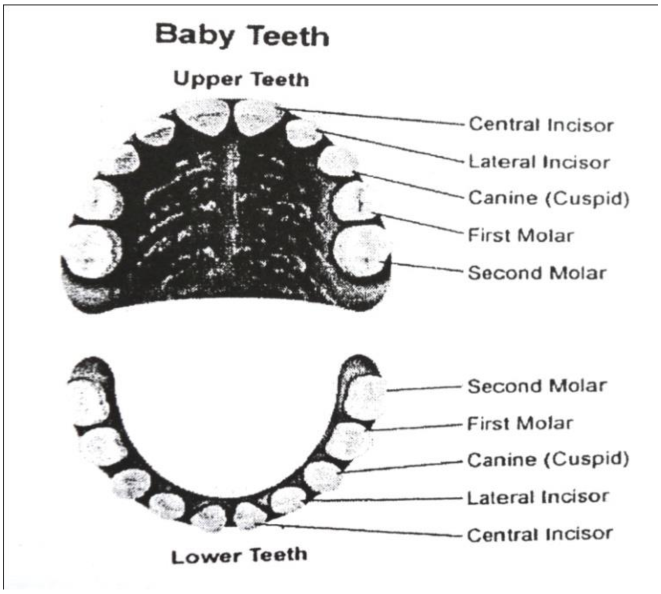

চিত্র-৫৭ (খ) ঃ অস্থায়ী দাঁত

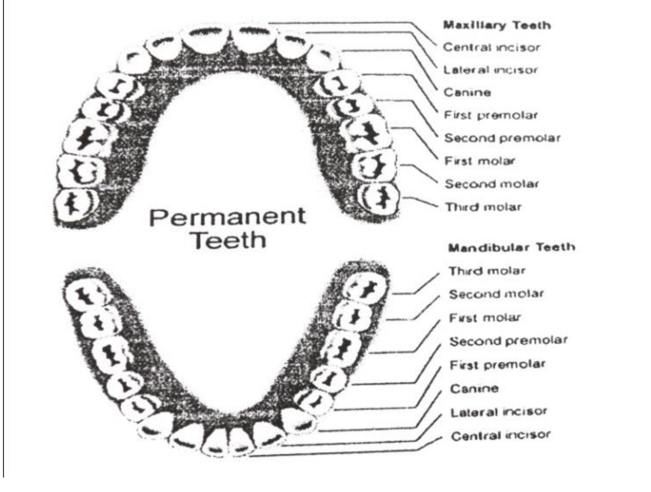

চিত্র-৫৭ (গ) ঃ অস্থায়ী দাঁত

মাড়ি (Gingiva or Gum) ঃ

ইহা দাঁত বেষ্ঠনকারী মুখীয় শ্লেষ্মা ঝিল্লীর অংশ। তরুন বয়সে মাড়ি এনামেলের সাথে যুক্ত থাকে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সংযোগ ঢিলা হয়ে যায়। তাই বৃদ্ধদের মাড়ি শুধু সিমেন্টারের সাথে যুক্ত থাকে। মাড়িতে প্রদাহ হলে মাড়ি ফুলে যায়, দাঁত ব্রাশ করার সময় দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত আসে ও ব্যথা করে এবং মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। এমন অবস্থাকে মাড়ির প্রদাহ (Gingivitis) বলে।

দাঁতের কার্যাবলী ঃ

দাঁতের কার্যাবলী সম্পর্কে ইতিমেধ্য আলোচনা করা হয়েছে।

অস্থায়ী এবং স্থায়ী দাঁত ওঠার বয়সের ছক নিম্নে উল্লেখ করা হল-

দাঁত ওঠার সময় (বয়স) ঃ

দাঁত ওঠার বয়স		
দাঁতের নাম	**দুধ দাঁত (অস্থায়ী দাঁত)**	**স্থায়ী দাঁত**
ইনসিজর দাঁত ঃ নীচের	৬-৯ মাস	৬-৮ বছর
উপরের		৭-৯ বছর
ক্যানাইন দাঁত ঃ নীচের	১৬-১৮ মাস	৯-১০ বছর
উপরের		১১-১২ বছর
প্রিমোলার দাঁত ঃ	....	১০-১২ বছর
মোলার দাঁত ঃ		
১ম মোলার দাঁত	১২-১৪ মাস	৬-৭ বছর
২য় মোলার দাঁত	২০-৩০ মাস	১১-১৩ বছর
৩য় মোলার দাঁত	....	১৭-২১ বছর

পাঠ-৩৪
শারীরিক অসুস্থতা ও এর কারণ

শারীরিক অসুস্থতা

দেহের কোন অংশ বা অঙ্গ বা সম্পূর্ণ দেহের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটলে তাকে শারীরিক অসুস্থতা বলা হয়। দেহের স্বাভাবিক কাজের ব্যাঘাতের ফলে নানাবিধ অসুবিধা হয়।

শারীরিক অসুস্থতার কারণ ঃ

নানাবিধ কারণে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মূলত নিম্নোক্ত কারণে শরীর অসুস্থ হয় ঃ

১) আঘাতজনিত কারণঃ যেমন- কেটে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া, উপর থেকে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

২) জীবাণু সংক্রমণজনিত ঃ

- ব্যকটেরিয়া
- ভাইরাস
- পরজীবি
- ছত্রাক/ফাংগাস

৩) শরীরের আভ্যন্তরীন অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঃ যেমন- টিউমার, ব্লাড ক্যান্সার, পারপুরা ইত্যাদি।

৪) পুষ্টিজনিত ঃ

(ক) পুষ্টিহীনতা ঃ যেমন- ম্যারাসমাস, কোয়শিওরকর, রাতকানা রোগ ইত্যাদি।

(খ) অধিক পুষ্টি ঃ যেমন- অতিরিক্ত মোটা (Obestiy), হাইপারলিপিডেমিয়া ইত্যাদি।

৫) **চিকিৎসাজনিত জটিলতা ঃ** ভুল চিকিৎসা বা অসাবধানতার জন্য সঠিক চিকিৎসা না পাওয়া বা হওয়া, ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি।

৬) **অজানা কারণে ঃ** অনেক অসুখ হয় যার কারণ সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব হয় না।

অসুস্থতায় শরীরে যে পরিবর্তন হয় ঃ

অসুস্থাবস্থায় আক্রান্ত অঙ্গের কোষে কতকগুলো পরিবর্তন ঘটে। এজন্য নানা রকম শারীরিক অসুবিধা দেখা যায়। পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ ঃ

১) প্রদাহের (Inflammation) সৃষ্টি হয়। প্রদাহের ফলে আক্রান্ত স্থানে যে পরিবর্তন হয় তা হলো-

- রক্ত সরবরাহ বেড়ে যায় বলে সেই স্থান লাল দেখায়
- তাপমাত্রা বেড়ে যায় অর্থাৎ সেই স্থান গরম অনুভূত হয়

- আক্রান্ত স্থান গুলো ফুলে যায়
- আক্রান্ত স্থানে ব্যথা অনুভূত হয়

২) আক্রান্ত অঙ্গের কোষসমূহের রস নিঃসরণ (Secretion) বেড়ে যায়। যেমন- ঠান্ডা লাগলে সর্দি হয়, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, লিউকোরিয়া ইত্যাদি।

৩) ক্ষত বা ঘা-এর সৃষ্টি হয়।

৪) স্থানীয় লিমফেটিক গ্ল্যান্ডসমূহ ফুলে যায় এবং ব্যথা অনুভব হয়।

অধ্যায় ২ ঃ ফার্মাকোলজি

পাঠ-১
মৌলিক ফার্মাকোলজি

ফার্মাকোলজি :

বিজ্ঞানের যে শাখায় একটি ঔষধের উৎস থেকে শুরু করে এটি মানব দেহের উপর যে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে "ফার্মাকোলজি" বলে।

ফার্মাকোলজি'র দু'টি প্রধান শাখা হলো-

ফার্মাকোকাইনেটিকস ঃ

ফার্মাকোলজির যে শাখায় ঔষধের শোষণ, বন্টন, বিপাক এবং নিস্কর্ষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে "ফার্মাকোকাইনেটিকস" বলে।

ফার্মাকোডাইনামিক ঃ

ফার্মাকোলজির যে শাখায় দেহের উপর ঔষধ বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে " ফার্মাকোডাইনামিক" বলে।

এছাড়াও নিচে আরো কিছু শাখার নাম দেওয়া হলো-

ক্লিনিকাল ফার্মাকোলজি :

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে শাখা জীব ও মানব দেহের উপর চিকিৎসার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।

নিউরোফার্মাকোলজি :

যে শাখা স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার উপর ঔষধের প্রভাব সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

সাইকোফার্মাকোলজি :

যে শাখা মস্তিস্কের উপর ঔষধের ক্রিয়া ও এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ, আচরনগত পার্থক্য নির্ণয় ও শারীরতাত্বিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

পোসোলজি :

যে শাখা কিভাবে ঔষধের ডোজ নির্ধারণ করা হয় সে সম্পর্কিত জ্ঞান (নির্ভর করে রোগীর বয়স, ওজন, লিঙ্গ, আবহাওয়া ইত্যাদির উপর) নিয়ে আলোচনা করে।

ফার্মাকোগনসি :

যে শাখা ভেষজ গুনাগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণীজ পদার্থ থেকে চিকিৎসাগত দ্রব্যাদির আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, সুষ্ঠু বন্টন ও বিতরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

ফার্মাকোজেনেটিক্স :

যে শাখা বিভিন্ন জাত, বিভাগ, বর্ণ, তারতম্য ভেদে ঔষধের প্রভাবে পার্থক্য নিরুপণ করা এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে সঠিক পরিমানের ও সর্বনিম্ন প্রতিক্রিয়াযুক্ত ঔষধ নির্বাচন করা নিয়ে আলোচনা করে।

ফার্মাকোজেনোমিক্স :

যে শাখা ঔষধ প্রযুক্তিতে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে এবং এই সম্পর্কিত বিদ্যমান ঔষধের উন্নয়ন এবং নতুন ঔষধ আবিস্কারের নিমিত্তে গবেষণা করে ।

পাঠ-২
ঔষধ ও বিভিন্ন রোগে ব্যবহৃত ঔষধের পরিচিতি

ঔষধ (Medicine)

ঔষধ এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যা শরীরের অভ্যন্তরে বা বাহিরে প্রয়োগ করে রোগ নির্ণয়, রোগ প্রতিরোধ, উপসর্গ উপসম এবং রোগ নিরাময় করা হয়।

দেহে ঔষধের কাজ বিভিন্ন রকম হতে পারে। বিভিন্ন ঔষধের ভিন্ন ভিন্ন কাজ রয়েছে। এগুলোর কিছু কিছু নীচে বর্ণনা করা হলোঃ

১। **যে সমস্ত ঔষধ রোগ জীবানুকে ধ্বংস করে। যেমন-**

- এন্টিবায়োটিক-যা ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে। পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, এমক্সিসিলিন, কোট্রাইমোক্সাজল, টেট্রাসাইক্লিন ইত্যাদি এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ।
- এন্টিপ্যারাসাইটিক- যা পরজীবিকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে। যেমন, বিভিন্ন ধরনের কৃমি-এর হলো পরজীবি। এলবেনডাজল, মেবেনডাজল, লিভামিসল ইত্যাদি কৃমিনাশক ঔষধ।

২। **যে সমস্ত ঔষধ কোন অঙ্গ বা তন্ত্রের উপর কাজ করে। এসব ঔষধ কাজ করে ঃ**

- স্নায়ু তন্ত্রের উপর ঃ উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রশান্তিদায়ক বা স্নায়ুর উত্তেজনা শান্তকারক ঔষধ (Tranquilizer/Sedative), যেমন- ডায়াজিপাম। ব্যাথানাশক ঔষধ (Analgesic), যেমন- প্যারাসিটামল, এসপিরিন, ডিসপিরিন, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, হাইওসিন বিউটাইল ব্রোমাইড ইত্যাদি। জ্বর উপসমকারী ঔষধ (Antipyretic), যেমন- প্যারাসিটামল। অনুভূতিনাশক ঔষধ (Anaesthetic), যেমন-লিগনোকেইন (Lignocaine) ইত্যাদি।
- জরায়ুর উপর ঃ প্রসবের পর রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ঔষধ জরায়ূর ম্যাাংসপেশীর সংকোচন বাড়িয়ে দেয়। যেমন-অক্সিটোসিন, আরগোমেট্রিন।
- ফুসফুসের উপর ঃ হাঁপানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু ঔষধ ব্যবহার করা হয়। এ ঔষধ ফুসফুসের বাতাস প্রবেশের পথকে প্রসারিত/বড় করে দেয়। এগুলিকে ব্রংকোডাইলেটর (Bronchodilator) বলা হয়। যেমন- সালবিউটামল, থিওফাইলিন ইত্যাদি।

৩। **যে সমস্ত ঔষধ খাদ্যের সম্পুরক হিসেবে কাজ করে ঃ**

এসব ঔষধ খাদ্যের অত্যাবশ্যকীয় অংশ যোগান দেয় অথবা কোন ব্যক্তি খাদ্যের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাচ্ছে না অথবা তা শরীরে বিশোষিত (Absorption) হচ্ছে না। যেমন-ভিটামিন-এ, আয়রন, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন-সি, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি।

৪। **যে সমস্ত ঔষধ দেহের বিভিন্ন অংশে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণ ঠিক করে ঃ**

যেমন- এন্টাসিড, খাবার স্যালাইন ইত্যাদি। খাবার স্যালাইন একজন রোগীর ডায়রিয়াজনিত কারণে নির্গত পানি ও লবনের অভাব পূরণ করে।

ঔষধ কিভাবে কাজ করে ?

ঔষধ সাধারণতঃ মুখে খাওয়ার মাধ্যমে অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। ঔষধ মুখে খাওয়ার পর পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে অন্ত্রে প্রবেশ করে। সেখানে এগুলো বিশোষিত হয়ে রক্তের মধ্যে মিশে যায় এবং এই স্রোত দেহের যে সমস্ত অংশে রক্তের সরবরাহ আছে সেখানে ঔষধ বহন করে নিয়ে যায়। যে সব ঔষধ ইনজেকশন হিসেবে দেয়া হয় সেগুলো সরাসরি রক্ত স্রোতে মিশে। এজন্য ইনজেকশন তাড়াতাড়ি কাজ করে।

ঔষধ শুধুমাত্র দেহের একটি অংশে কাজ করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলেও রক্তস্রোতে কিন্তু এই ঔষধকে দেহের অনেক অংশে নিয়ে যায়। সেজন্য দেহের অন্যান্য অংশেও ঔষধ অযাচিতভাবে কাজ করতে পারে। যেমন ধরুন-এসপিরিন, ইহা স্নায়ু তন্ত্রের উপর কাজ করে ব্যথা উপসম করে। কিন্তু এটা আবার পাকস্থলীর ঝিল্লীতেও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে (যা ক্ষতিকর হতে পারে), তাছাড়া এসপিরিন সন্ধির প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে (যা উপকারী হতে পারে)। এ ধরনের ফলাফলকে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া (Side effect) বলা হয়।

ঔষধের বিভিন্ন ধরন ঃ

১। **ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ, ড্রপ ঃ** এগুলো মুখ (Oral) দিয়ে গিলে ব্যবহার করা হয়।

২। **ইনজেকশন ঃ** এগুলো চামড়ার ভিতর (I/D), চামড়ার নীচে (S/C), মাংসে (I/M), শিরায় (I/V) ব্যবহার করা হয়।

৩। **সাপোজিটরি ঃ** এগুলো পায়ুপথে (Anus) ব্যবহার করা হয়। যেমন- বিভিন্ন ব্যথানাশক ও জ্বরের ঔষধ। যেসব রোগীর এ গ্রুপের ঔষধ মুখে খেলে গ্যাষ্ট্রিক আলসারের (পেটে ব্যথা) সমস্যা হতে পারে অথবা মুখে খাওয়ানো সম্ভব না হলে কিংবা খেতে না পারলে সে সব রোগীর ক্ষেত্রে দ্রুত কাজের জন্য সাপোজিটরি (Suppositry) ব্যবহার করা হয়। যেমন- নাপা সাপোজিটরি, ডাইক্লোন সাপোজিটরি ।

৪। **ইনহেলার ঃ** মুখের মধ্যে পাফ দিয়ে শ্বাস টানের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়। যেমন-যেমন- সালবিউটামল, (ভেন্টোলিন) ইনহেলার।

৫। **ক্রিম, অয়েন্টমেন্ট, পাউডার ঃ** এগুলো সাধারাণত ঃ শরীরের বহিরাংশে (Topical) ব্যবহার করা হয়। যেমন- নিওমাইসিন ক্রিম, বেটনোভেট অয়েন্টমেন্ট, নেবানল পাউডার ইত্যাদি।

রোগ/উপসর্গ অনুযায়ী প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ঔষধের পরিচিতি ঃ

	রোগ/উপসর্গ	**নির্দেশিত ঔষধ (জেনেরিক নাম)**
১	শ্বাস তন্ত্রের সংক্রমণ	ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন, এমপিসিলিন, কো-ট্রাইমোক্সাজল
২	জ্বর ব্যথা	প্যারাসিটামল, এসপিরিন, আইবুপ্রোফেন, ইন্ডোমেথাসিন
৩	পেট ও ব্যথা	হাইওসিন বিউটাইল ব্রোমাইড, ডোটাভেরিন
৪	হাপানী	সালবিউটামাল, এমাইনোফাইলিন, থিওফাইলিন
৫	সাধারণ সর্দি-কাশি, এলার্জি	প্রোমেথাজিন, ক্লোরফেনিরামিন

৬	চুলকানি ও খোস-পাঁচড়া	বেনজাইল বেনজোয়েট, পারমেথ্রিন
৭	দাঁদ ও ছত্রাক জাতীয় সংক্রমণ	বেনজোয়িক এসিড এবং স্যালিসাইলক এসিড, ক্লট্রিমাজল অয়েন্টমেন্ট/ক্রিম
৮	রাতকানা	উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন-এ
৯	কৃমি	মেবেনডাজল, এ্যালবেনডাজল, লেভামিসল
১০	প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ	আরগোমেট্রিন, অক্সিটোসিন
১১	রক্ত আমাশয়	কো-ট্রাইমোক্সাজল, ন্যালিড্যাক্সিক এসিড, সিপ্রোফ্লোক্সাসিন
১২	রক্তস্বল্পতা	আয়রণ এবং ফলিক এসিড
১৩	অপুষ্টি, দূর্বলতা	ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, মাল্টিভিটামিন
১৪	চোখের সংক্রমণ	ক্লোরামফেনিকল চোখের ড্রপ ও টেট্রাসাইক্লিন চোখের মলম।
১৫	মনিলিয়াল সংক্রমণ	জেনশিয়াল ভায়োলেট লোশন, নিসট্যাটিন পেসারী
১৬	ত্বক/চামড়া জীবাণুমুক্ত করার জন্য	ক্লোরহেক্সিডিন, টিংচার আয়োডিন লোশন
১৭	পেপটিক আলসার	এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড (এন্টাসিড), রেনিটিডিন, ওমিপ্রাজল
১৮	কাটা, ক্ষত, পোড়া, ত্বকে ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ	নিওমাইসিন ব্যসিট্রিন অয়েন্টমেন্ট/ক্রিম বা পাউডার
১৯	মুখের কোনায় বা জিহ্বায় ঘা	রিবোফ্লাভিন
২০	জিহ্বায়, মুখের ভিতর ঘা/থ্রাস	নিসট্যাটিন ট্যাবলেট বা ড্রপ
২১	বমি, বমি ভাব	প্রোক্লোরপারেজিন (ষ্টিমিটিল), ডমপেরিডন
২২	রুচি বৃদ্ধিকারক, মস্তিস্কের পরিপক্কতায়	জিংক সালফেট
২৩	হাড় ক্ষয়রোধক, বাতের ব্যথা, গর্ভাবস্থায়	ক্যাসিয়াম এবং ভিটামিন- ডি
২৪	হাত-পা জ্বালা-পোড়া করা	ভিটামিন বি১ (থিয়ামিন হাইডোক্লোরাইড), বি৬ (পাইরিডক্সিন), এবং বি১২ (সায়ানোকোবালামাইন)
২৫	ম্যালেরিয়া	ক্লোরোকুইন, প্রিমাকুইন, কুইনাইন

২৬	বন্ধ্যাকরণ অপারেশনের পূর্বে ব্যবহৃত ঔষধ	ডায়াজিপাম, প্রোমেথাজিন, প্যাথিডিন, হাইড্রোক্লোরাইড, পেন্টাজোসিন, এট্রোপিন ও স্থানীয় অনুভূতি নাশক ঔষধ (লিগনোকেইন)
২৭	অনিদ্রা বা মৃদু শান্তকারক	ডায়াজিপাম

কিট কি? বিভিন্ন প্রকার কিট সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ঃ

কিট (Kit) কি?

স্বাস্থ্য কর্মীকে বিভিন্ন প্রকার স্বাস্থ্য সেবামূলক কাজ করতে হয়। এই সব কাজ সঠিকভবে করার সুবিধার জন্য যে সব প্রয়োজনীয় জিনিস দরকার সেগুলো একত্রিতভাবে এক জায়গায় যে বাক্সে রাখা থাকে তাকে কিট (Kit) বলে।

ডিডিএস কিট (Drugs & Deitery Suppliment Kit) ঃ

কিট বাক্সের মধ্যে কিছু সাধারণ রোগের ঔষধ ও খাদ্য পরিপূরক জাতীয় ঔষধ দেয়া থাকে। বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সাধারণ অসুখের ও অপুষ্টিজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য এই কিট বাক্স সরবারহ করা হয়। কিট বাক্স জেলা পণ্যাগার থেকে সরবারহ করা হয। কিট বাক্স সাধারণতঃ উপজেলা থেকে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়।

পাঠ-৩
অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ

অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ (Essential Drugs)

অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ স্বাস্থ্য কর্মসূচীর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঔষধ হচ্ছে রোগী এবং স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে সর্বশেষ যোগসূত্র। এ যোগসূত্রই অনেক সময় নির্ধারণ করে এই বিশাল সামাজিক বিনিয়োগের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ হচ্ছে সেই সমস্ত ঔষধ, যেগুলো সবচেয়ে কার্যকরী, নিরাপদ, অর্থসাশ্রয়ী এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করে।

ঔষধের গুরুত্ব ঃ

স্বাস্থ্য সেবার প্রবেশ গম্যতা এবং সুদক্ষ কর্মী বাহিনী যে কোন স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচীর প্রয়োজনীয় উপাদান। সেই সঙ্গে ঔষধও স্বাস্থ্য সেবার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঔষধ স্বাস্থ্য সেবার জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে অন্ততঃ পাঁচটি কারণে। তা হলো ঃ

১. ঔষধ জীবন রক্ষা করে এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়

২. ঔষধ স্বাস্থ্য সেবার প্রতি আস্থা আনে এবং এতে জনগনের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে

৩. ঔষধ ব্যয় সাপেক্ষ

৪.অন্যান্য গ্রাহক পণ্য থেকে ঔষধ আলাদা।

৫.ঔষধের সরবরাহ যথেষ্ঠ উন্নতি করা সম্ভব।

অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকা

১। **এআরআই বা শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহে ব্যবহৃত ঔষধ ঃ**

- কো-ট্রাইমোক্সাজল
- এমক্সিসিলিন
- প্যারাসিটামল
- প্রোকেইন পেনিসিলিন
- সালবিউটামল
- থিওফাইনিল
- অ্যামাইনোফাইলিন

২। **ডায়রিয়া জনিত রোগে ব্যবহৃত ঔষধ ঃ**

- খাবার স্যালাইন
- কো-ট্রাইমোক্সাজল
- ন্যালিড্যাক্সিক এসিড
- টেট্রাসাইক্লিন
- ডক্সিসাইক্লিন

- মেট্রোনিডাজল
- ইরাইথ্রোমাইসিন

৩। ডায়রিয়াজনিত রোগে ব্যবহৃত আই/ভি ফ্লুইড (I/V Fluid) ঃ

- কলেরা স্যালাইন
- নরমাল স্যালাইন
- রিংগার'স ল্যাকটেট সলিউশন
- হার্টম্যান'স সলিউশন

৪। ভিটামিন এ অভাবজনিত রোগে ব্যবহৃত ঔষধ ঃ

- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন-এ

৫। মাতৃস্বাস্থ্য সমস্যায় ব্যবহৃত ঔষধ ঃ

- এমক্সিসিলিন
- ফেরাস ফিউমারেট ও ফলিক এসিড
- আরগোমেট্রিন
- মেট্রোনিডাজল
- ডায়াজিপাম
- মিথাইলডোপা

৬। প্রজনন তন্ত্রের প্রদাহ এবং যৌন রোগে ব্যবহৃত ঔষধ ঃ

- বেনজাইল পেনিসিলিন
- টেট্রাসাইক্লিন
- ডক্সিসাইক্লিন
- ইরাইথ্রোমাইসিন
- সিপ্রোফ্লোক্সাসিন
- মেট্রোনিডাজল
- ক্লোট্রিমাজল
- ফ্লুকোনাজল
- সেফট্রিয়াকজন

৭। সংক্রামক ব্যাধিসমূহে ব্যবহৃত ঔষধ ঃ

(ক) যক্ষা রোগে ব্যবহৃত ঔষধ ঃ

- আইসোনিয়াজাইড
- রিফামপিসিন
- ইথামবিউটল
- থায়াসিটাজন
- পাইরাজিনামাইড

(খ) ম্যালেরিয়া রোগে ব্যবহৃত ঔষধ ঃ

- ক্লোরোকুইন
- কুইনাইন
- প্রিমাকুইন
- সালফাডক্সিন
- পাইরিমিথামিন

৮। **সাধারণ রোগসমূহে ব্যবহৃত ঔষধ ঃ**

- মেবেন্ডাজল
- এ্যালবেন্ডাজল
- এলুমিনিয়াম ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড (এন্টাসিড)
- রেনিটিডিন
- বেনজাইল বেনজোয়েট
- পারমেথ্রিন
- বেনজয়িক এসিড-সেলিসাইলিক এসিড (হুইটফিল্ড)
- গ্রাইসোফুলভিন
- জেনসিয়ান ভায়োলেট
- ক্লোরহেক্সিডিন
- ফেনক্সিমিথাইল পেনিসিলিন
- টেট্রাসাইক্লিন আই অয়েন্টমেন্ট
- জেনটামাইসিন আই ড্রপ
- রিবোফ্লাভিন
- থায়ামিন
- আইবুপ্রোফেন
- ডাই ক্লোফেনাক সোডিয়াম
- এসপিরিন
- হায়োসিন-এন-বিউটাইল ব্রোমাইড
- ডায়াজিপাম
- ফেনোবারবিটন
- এড্রিনালিন
- প্রেডনিসোলন
- ডেক্সামেথাসোন
- প্রোমেথাজিন
- ক্লোরফেনিরামিন
- হাইড্রোক্লোরাথায়াজাইড
- এটিনোলোল

- প্রোক্লোরপারেজিন (ষ্টিমিটিল)
- ডমপেরিডন
- জিংক সালফেট
- ক্যালসিয়াম + ভিটামিন-ডি
- নিসট্যাটিন
- আরগোমেট্রিন
- নিওমাইসিন ব্যসিট্রাসিন অয়েন্টমেন্ট।

৯। যে সকল ঔষধ গর্ভাবস্থায় দেয়া যাবে না ঃ

- ভিটামিন এ এবং এর উপস্থিতি আছে এমন
- মেথোট্রেক্সাট
- টেট্রাসাইক্লিন
- ক্লোরামফেনিকল
- আইসোনিয়াজিড
- সোডিয়াম ভালপ্রোএট
- লিথিয়াম
- মরফিন
- এ্যান্টি থাইরয়েড ড্রাগ্স
- সালফোনামাইড
- এ্যাসপিরিন
- আমলোডিপিন/এ্যাট্রোভাটাটিন
- রসুভাসটাটিন
- ফ্লুকোনাজল
- মেক্লিজিন
- লোরাটাডিন
- ভিটামিন কে
- মেট্রোনিডাজল
- ইবুপ্রফেন
- ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ
- ডাইক্লোফেনাক
- প্রিমাকুইন
- স্ট্রেপটোমাইসিন
- ফ্লুরোকুইনোলোন্স
- প্রোমেথাজাইন
- ফেনোবারবিটাল
- মিজল্‌স, মাম্পস, রুবেলা, পোলিও, চিকেনপক্স এবং ইয়োলো ফিভার জন্য ভ্যাকসিন

(সূত্র :
1. Drug Information Center/KAUH, DRUGS CONTRAINDICATED IN PREGNANCY, Prepared by: Pharm.D, Neda'Rawashdeh
2. lexi.com
3. Drugs Contraindicated in Pregnancy, April 05, 2013.http://www.empr.com/drug contraindicatedIn pregnancy/article/125914/)

পাঠ-৪

ঔষধ প্রয়োগের পথসমূহ

ঔষধ প্রয়োগের পথ (Route of Drug Use) কি ?

ঔষধ গিলে খাওয়া যায়, ইনজেকশন হিসেবে ত্বকের নীচে বা মাংসপেশীতে দেয়া যায়, ত্বকে ঘষা যায়, জিহ্বার নীচে রাখা যায় ইত্যাদি। ঔষধ প্রয়োগের এসব পদ্ধতিকে "ঔষধের প্রয়োগের পথ" বল হয়।

	ঔষধের প্রয়োগ পথসমূহ	**উদাহরণ**
১	মুখে খাওয়া (Oral Route)	বড়ি, ক্যাপসুল, সিরাপ
২	জিহ্বার নীচে (Sublingual Route)	বড়ি যেমন-নাইট্রোগ্লিসারিন
৩	ইনজেকশন (Parenteral Route)	বিভিন্ন প্রকার এন্টিবায়োটিক, আইভি স্যালাইন, ব্যথার ঔষধ
৪	শ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে (Inhalation Route)	সালবিউটামল ইনহেলার
৫	স্থানীয় ব্যবহার (Topical Route)	মলম, লোশন, চোখের বা কানের ড্রপ
৬	জনন নালী পথে (Vaginal Route)	ফোম, বড়ি
৭	পায়ু পথে (Rectal Route)	জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল এবং ব্যথানাশক, যেমন- ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম, এন্ডোমেথাসিন সাপোজিটরি

ঔষধের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ পথের সুবিধা - অসুবিধাসমূহ ঃ

প্রধান প্রধান প্রয়োগ পথগুলোর সুবিধা-অসুবিধা নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ

১) মুখে খাওয়া (Oral Route)

সুবিধাঃ

ক) নিরাপদ, সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং তুলনামূলকভাবে খরচ অনেক কম।

খ) সহজেই প্রয়োগ করা যায়। রোগী নিজে বা তার আত্মীয়স্বজন ঔষধ প্রয়োগ করতে পারে।

গ) সূঁচ ফোড়ানোর ভয় ও উদ্বেগ থাকে না এবং ব্যথা পাওয়া বা ব্যথা সহ্য করতে হয় না।

ঘ) এই পথে ব্যবহৃত ঔষধ ইনজেকশনের মত সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না।

অসুবিধা ঃ

ক) বমি হতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ হয় না।

খ) কিছু কিছু ঔষধ পাচক রস দ্বারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সেজন্য দেহের যে অংশে এর প্রয়োজন সেখানে পৌছায় না।

গ) কিছু ঔষধ খাদ্যের সাথে মিশে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করতে পারে যা সহজে বিশোষিত হতে পারে না।

ঘ) ডায়রিয়ার কারণে পর্যাপ্ত সময় অন্ত্রে না থাকার ফলে অনেক ঔষধ সম্পূর্ণরূপে বিশোষিত হতে পারে না।

ঙ) কিচু ঔষধ অন্ত্র থেকে মোটেই বিশোষিত হয় না।

চ) অন্ত্রে বিশোষিত হতে সময় লাগে তাই ইনজেকশনের তুলনায় মুখে খাওয়ার ঔষধ দেরীতে কাজ শুরু করে।

ছ) জরুরী অবস্থা, অজ্ঞান ও অসহযোগী রোগীদের ক্ষেত্রে এই পথে ঔষধ প্রয়োগ উপযুক্ত নয়।

২) জিহ্বার নীচে (Sublingual Route)

এই পথে ঔষধ জিহ্বার নীচে রেখে আস্তে আস্তে গলতে দেয়া হয়। জিহ্বার শ্লেষ্মা ঝিল্লীর মাধ্যমে এগুলো রক্তস্রোতের সাথে মিশে যায় এবং খাওয়ার ঔষধের মত গিলতে হয় না এবং পাকস্থলীর মধ্য দিয়ে যেতে হয় না।

সুবিধা ঃ

ক) দ্রুত বিশোষিত হয়।

খ) চাহিদা অনুযায়ী ফল লাভের পর অবশিষ্ট ঔষধ ফেলে দেয়া যায়।

অসুবিধাঃ

ক) যে সেকল ঔষধ স্বাদে অতৃপ্তিকর এই পথ সেসব ঔষধের জন্য উপযুক্ত নয়।

৩) ইনজেকশন (Parenteral Route)

সুবিধা ঃ

ক) দ্রুত বিশোষিত হয়, যেহেতু পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয় না।

খ) ঔষধের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হওয়া যায়।

গ) ঔষধের পরিমাণ শুদ্ধরূপে নিরূপন করা যায়।

ঘ) অজ্ঞান ও অসহযোগী রোগীদেরকে প্রয়োগ করা যায়।

ঙ) অতিরিক্ত বমির জন্য যে সব রোগী ঔষধ খেতে পারে না তাদের ক্ষেত্রে এই পথে ঔষধ প্রয়োগ ফলদায়ক।

অসুবিধা/সাবধানতা ঃ

ক) যে স্থানে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হবে সে স্থান জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে ও জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।

খ) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থানে ব্যথা ও এমনকি ফোঁড়া হতে পারে।

গ) ইনজেকশন প্রয়োগের স্থানে রক্তনালী বা স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত (Injury) হতে পারে। স্নায়ু আঘাতের ফলে মাংসপেশী দুর্বল ও অবশ (Paresis) হতে পারে।

ঘ) নিজে নিজে প্রয়োগ করা উচিত নয়। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন হয়।

ঙ) মাংসপেশীতে ঔষধ দেবার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া দেওয়া উচিত নয়।

ইনজেকশন পদ্ধতি আবার বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন-

ত্বকের মধ্যে (Intradermal- I/D)	-	ত্বকের মধ্যবর্তী স্তরে দেয়া হয়। যেমন- বিসিজি ভ্যাকসিন।
ত্বকের নীচে (Subcutaneous- S/C)	-	ত্বকের নীচে মাংসপেশীর উপর দেয়া হয়। যেমন- এড্রেনালীন, ইনসুলিন, হামের টিকা।
মাংসপেশীতে (Intramuscular- I/M)	-	মাংসপেশীতে দেয়া হয়। যেমন- পেনিসিলিন, ডিপিটি।
শিরায় (Intravenous- I/V)	-	শিরার মধ্যে দেয়া হয়। যেমন- আইভি স্যালাইন, বিভিন্ন প্রকার এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন।

শিরায় ইনজেকশন (I/V) ঃ

সুবিধা ঃ

ক) জরুরী মুহুর্তে দ্রুত ঔষধের কার্যকারীতার জন্য ব্যবহার করা যায়।

খ) অজ্ঞান রোগীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়।

গ) ঘন ঘন বমির ক্ষেত্রে, যে রোগী মুখে খেতে পারে না, সে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।

ঘ) যে সব ঔষধ মুখে খেলে পাকস্থলীর সমস্যা হতে পারে ও অন্ত্র থেকে শোষিত হতে পারে না, সেগুলো শিরা পথে দেওয়া যেতে পারে।

অসুবিধা/অসাবধানতা ঃ

ক) সম্পুর্ণ জীবাণুমুক্ত উপায় অবলম্বন করা অপরিহার্য।

খ) বেশি ডোজে এত দ্রুত প্রতিক্রিয়া হতে পারে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরত আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে যেতে পারে।

গ) এয়ার এম্বোলিজম, থ্রোমবাসিস, সূঁচ থেকে সংক্রমণ জাতীয়ী মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে যা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

ঘ) জীবাণুমুক্ত সিরিঞ্জ ব্যবহার না করলে হেপাটাইটিস-বি, এইডস প্রভৃতির মত মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

ঙ) আশে পাশের ধমনী, স্নায়ু আঘাতপ্রাপ্ত (Injury) হতে পারে।

চ) নিজে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর প্রয়োজন।

ছ) শিরা ছিদ্র হয়ে আশেপাশের টিস্যুতে ঔষধ লেগে ইরিটেশন হতে পারে।

জ) হাইপারসেনসিটিভিটি (Hypersensitivity) প্রতিক্রিয়া হতে পারে যা খুবই মারাত্মক। এজন্য শিরায় ইনজেকশন দেবার সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কখনই দেয়া উচিত নয়।

মাংসপেশীতে ইনজেকশন (I/M) ।

শিরায় (Intravenous) ইনজেকশন এর মত মাংশপেশীতে ঔষধ প্রয়োগের অনেক সুবিধা রয়েছে। তবে মাংশপেশীতে ইনজেকশন শিরার ইনজেকশনের তুলনায় ধীরে কাজ করে।

৪) **জনন নালী পথে (Vaginal Route)**

ক) সাদা স্রাব চিকিৎসার জন্য - বড়ি বা ক্রীম।

যেমন- মাইকোনাজল ভ্যাজাইনাল ক্রিম, নাইষ্টাটিন ভ্যাজাইনাল সাপোজিটরি।

৫) পায়ুপথে (Rectal Route)

ক) পেপটিক আলসারের রোগীদের জন্য ব্যথার ঔষধ মুখে দেয়া যায় না পায়ুপথে দিতে হয়।

যেমন -ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম সাপোজিটরি।

খ) কোষ্ঠকাঠিন্য নিরামায়ের জন্য। যেমন - গ্লিসারিন সাপোজিটরি।

পাঠ-৫

শিরায় (I/M) ব্যবহৃত সাল্যাইনসমূহের পরিচিতি ও ব্যবহারবিধি

সাধারণতঃ রক্তক্ষরণ হলে, বার বার বমি হলে, মুখে কিছু খেতে না পারলে, ডায়রিয়ায় চরম পানি স্বল্পতা দেখা দিলে, রক্তে খনিজ লবণের পরিমাণ কমে গেলে (Electroylyte Imbalance), রক্তক্ষরণ হলে, রক্তে গ্লুকোজ কমে গেলে, দুর্বলতায় এবং পুষ্টির প্রয়োজনে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর দ্বারা শিরায় স্যালাইন দেয়া হয়।

শিরায় (I/M) ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের স্যালাইন নিম্নরূপ ঃ

১	৫% ডি.এ (ডেক্সট্রোজ ইন এ্যকুয়া)	রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে, দুর্বলতায়, খেতে না পারলে বা অরুচি হলে এবঙ পুষ্টির জন্য দেয়া হয়।
২	১০% ডি.এ (ডেক্সট্রোজ ইন এ্যাকুয়া)	-ঐ-
৩	৫% ডি.এন. এ (ডেক্সট্রোজ ইন নরমাল স্যালাইন)	বার বার বমি করলে, রক্তচাপ কমে গেলে, শরীর থেকে অতিরিক্ত লবন-পানি বেরিয়ে গেলে (অতিরিক্ত ঘাম হলে), রক্তে খনিজ লবনের পরিমাণ কমে গেলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেয়া হয়।
৪	নরমাল স্যালাইন	রক্তচাপ কমে গেলে, শরীর থেকে অতিরিক্ত লবন-পানি বেরিয়ে গেলে (অতিরিক্ত ঘাম হলে), রক্তে খনিজ লবনের পরিমাণ কমে গেলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেয়া হয়।
৫	কলেরা স্যালাইন	ডায়রিয়া হলে, রক্তে খনিজ লবনের পরিমাণ কমে গেলে ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেয়া হয়।
৬	হার্টম্যান’স সলিউশন	রক্তক্ষরণ হলে, হাইপোভলিউমিক শক হলে দেয়া হয়
৭	রিংগার’স ল্যাকটেট সলিউশন	রক্তক্ষরণ হলে, হাইপোভলিউমিক শক হলে দেয়া হয়।
৮	বেবী স্যালাইন	বাচ্চাদের জন্য ডায়রিয়া হলে দেয়া হয়।

বিঃদ্রঃ

- ডায়াবেটিস থাকলে ডি.এ এবং ডি.এন.এস দেয়া যাবে না। নরমাল স্যালাইন দেয়া যাবে।
- উচ্চ রক্তচাপ থাকলে লবনযুক্ত স্যালাইন, যেমন- ডি.এন.এস নরমাল স্যালাইন ইত্যাদি দেয়া যাবে না। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ডি.এ দেয়া যাবে।

শিরায় স্যালাইন প্রয়োগের চেকলিষ্ট নিম্নরূপ ঃ

১। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি গুছিয়ে নিন, যেমন-

ক) শিরার স্যালাইন

খ) স্যালাইন ষ্ট্যান্ড

গ) **স্যালাইন সেটঃ স্যালাইন সেটে নিম্নলিখিত অংশ থাকে ঃ**

(i) নলঃ নলের দুই প্রান্ত এবং একটি রেগুলেটর থাকে।

- চওড়া প্রান্ত- এটি স্যালাইন ব্যাগের সাথে সংযোগ করা হয়। এখানে একটি চেম্বার থাকে যার মধ্যে স্যালাইন ফোঁটা গণনা করা হয়।
- সরুপ্রান্ত (নজলযুক্ত)- এটিতে বাটারফ্লাই সূঁচ সংযুক্ত করা হয়।
- রেগুলেটরের মাধ্যমে স্যালাইনের ফোঁটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। নীচের দিকে রেগুলেটরের চাকা নামালে স্যালাইনের ফোঁটা কমে যায় ও উপরের দিকে উঠালে ফোঁটা বেড়ে যায়।

(i i) বাটার ফ্লাই সূঁচ ঃ ইহা বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে। যেমন-

১৯ জি - বড়দের জন্য
২১ জি - ঐ
২৩ জি - বাচ্চাদের জন্য
২৫ জি - বাচ্চাদের জন্য
(যত বেশি নাম্বার হতে তত বেশী চিকন সুঁচ হবে)

ঘ) মাইক্রোপোর বা লিউকোপ্লাষ্ট

ঙ) তুলা

চ) রেকটিফাইড স্পিরিট বা স্যাভলন।

২। আপনি কি করতে যাচ্ছেন রোগীকে বুঝিয়ে বলুন।

৩। আপনার দুই হাত ভালভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে বাতাসে শুকিয়ে নিন।

৪। স্যালাইন ব্যাগ হাতে নিয়ে আলোতে পরীক্ষা করুন স্যালাইন ভিতরে কোন ময়লা আছে কি না। স্যালাইন ব্যাগটি স্যালাইন ষ্ট্যান্ডে ঝুলিয়ে দিন। স্যালাইন ষ্ট্যান্ড না থাকলে ব্যাগটি খাটের ষ্ট্যান্ড বা অন্য কোন উঁচু জায়গায় ঝুলিয়ে দিন।

৫। স্যালাইন সেটের যে প্রান্তে রাবার যুক্ত নজল আছে সেই প্রান্তে বাটারফ্লাই সূঁচ সংযুক্ত করুন। স্যালাইনে সংযোগের পূর্বে রেগুলেটরের চাকা নীচের দিকে নামিয়ে চ্যানেল বন্ধ রাখুন। অপর প্রান্ত অর্থাৎ চওড়া প্রান্তটি স্যালাইনের সাথে সংযোগ দিন। সেটের চেম্বারের নীচের অর্ধেক চাপ দিয়ে স্যালাইন দিয়ে অধপূর্ণ করুন।

৬। এবার রেগুলেটরের চাকা আস্তে আস্তে উপরের দিকে তুলুন ও চ্যানেল ওপেন করে কিছু স্যালাইন নল দিয়ে প্রবাহিত করে সূঁচ দিয়ে বাইরে ফেলে দিন। এতে নলের ভিতরের বাতাস বের হয়ে যাবে। তারপর রেগুলেটরের চাকা নীচের দিকে নামিয়ে চ্যানেল বন্ধ করুন।

৭। নিশ্চিত হোন স্যালাইন সেটের মধ্যে কোন বাতাস নেই। বাতাস থাকলে উপরের নিয়মে বাতাস বের করে দিয়ে রেগুলেটরের চাকা নীচের দিকে নামিয়ে চ্যানেল বন্ধ করুন।

৮। রোগীকে শুইয়ে দিন।

৯। যে হাতে স্যালাইন দিবেন রোগীকে সেই হাত মুঠি করতে বলুন যাতে হাতের পৃষ্ঠদেশের শিরা পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠে ও টান টান হয়। শিরা আরও পরিস্কার ভাবে বোঝার জন্য কব্জির উপরের দিকে হাত সাহায্যকারীকে (যদি থাকে) জোরে চেপে ধরতে বলুন বা টরনিকুয়েট (যেমন - স্যালাইন সেটের নল বা দড়ি) দিয়ে বেধে নিন।

১০। যে শিরায় স্যালাইন দিবেন সেই জায়গাটি এন্টিসেপটিক যুক্ত তুলা দিয়ে ভাল করে পরিস্কার করে নিন।

১১। শিরার উপরের চামড়াটি টান টান করুন।

১২। এবার বাটারফ্লাই সূঁচের দুই পাশের ডানার মত অংশটি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী দিয়ে চেপে ধরুন। লক্ষ্য রাখুন যাতে সূঁচে হাত না লাগে

১৩। তারপর সূঁচের অগ্রভাগ ৩০ ডিগ্রী কোণে শিরার এক পাশ দিয়ে চামড়া ভেদ করে শিরায় ঢুকান ও শিরার গতি পথ অনুযায়ী সূঁচটি প্রবেশ করান। লক্ষ্য রাখবেন শিরা যেন দুই পাশে ছিদ্র হয়ে না যায়।

১৪। নিশ্চিত হউন সূঁচটি শিরায় প্রবেশ করেছে। যদি বাটারফ্লাই সূঁচের নলে রক্ত আসে তবে বুঝতে হবে সূঁচ শিরায় প্রবেশ করেছে যদি রক্ত না আসে বুঝতে হবে সূঁচ শিরায় প্রবেশ করে নাই। সেক্ষেত্রে সূঁচটি বাহিরের দিকে সামান্য টেনে আবার ঢুকাতে হবে ও নিশ্চিত হতে হবে যে সূঁচ শিরায় প্রবেশ করেছে।

১৫। সূঁচটি শিরায় প্রবেশ করেছে নিশ্চিত হবার পর রোগীকে হাতের মুঠি খুলতে ও হাতের বাধ খুলে দিন। রেগুলেটরের চাকা উপরের দিকে উঠিয়ে স্যালাইন চালু করেন।

১৬। এবার মাইক্রোপার দিয়ে বাটারফ্লাই সূঁচের উপরের অংশ আটকে দিন যাতে সূঁচ নড়ে না যায়। তারপর আর এক খন্ড মাইক্রোপোর দিয়ে সূঁচের ডানার মত অংশের নীচ দিয়ে উপরে এনে ক্রস করে চামড়ার সাথে আটকে দিন। অতঃপর বাটারফ্লাই সূঁচের নলটি হাতের মধ্যমা আঙ্গুলের নীচ দিয়ে পেচিয়ে এনে হাতের পৃষ্ঠদেশের চামড়ায় আটকে দিন যাতে করে সূঁচটি স্থানান্তরিত না হয়।

১৭। এবার রেগুলেটর দিয়ে কন্ট্রোল করে প্রয়োজন অনুযায়ী স্যালাইনের ফোঁটা নির্ধারণ করুন। সাধারণতঃ মিনিটে ৩০ ফোটা করে দিতে হয়।

তবে ডায়রিয়া রোগীদের মারাত্বক পানি স্বল্পতার ক্ষেত্রে মিনিটে অগণিত ফোঁটা (Running) স্যালাইন দেওয়া যেতে পারে। (১ মি.লি. = ১৫ ফোঁটা)।

১৮। স্যালাইন যুক্ত হাতটি রোগীর পেটের উপরে বা পাশে সোজা করে আরাম দায়ক অবস্থানে রাখুন (হাত বেশী নাড়া চড়া করা যাবে না) যাতে সূঁচ স্থানান্তরিত না হয় ও অবাধে স্যালাইন চলতে পারে।

সতর্কতা ঃ অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী শিরায় স্যালাইন দিতে হবে।

- লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিরা দুই পার্শ্বে ছিদ্র (Double Puncture) হয়ে না যায়। শিরা দুই পার্শ্বে ছিদ্র হয়ে গেলে রক্ত চামড়ার নীচে এসে জমা হয়ে ফুলে যায় ও জায়গাটিতে ব্যথা অনুভব হয়। এ ক্ষেত্রে স্যালাইন বন্ধ করে দিতে হবে ও সূঁচটি বের করে অন্য শিরায় দিতে হবে।
- স্যালাইন সেটের ভিতর বাতাস থাকলে (নলের ভিতর স্যালাইন ফাঁকে ফাঁকে খালি জায়গা ও বুদ বুদ দেখা যাবে) বাতাস বাহিরে বের করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে কোন অবস্থাতেই যেন বাতাস শিরায় প্রবেশ না করে। বাতাস শিরায় প্রবেশ করলে এয়ার এম্বোলিজম হয় যা অত্যন্ত মারাত্মক, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
- লক্ষ্য করুন স্যালাইনের কোন-প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কি না।

  পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ হলো ঃ শরীরে কাঁপুনি (Rigor), শীত শীত ভাব, শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। পাশ্ব-প্রতিক্রিয়ার লক্ষন দেখা মাত্রই স্যালাইন বন্ধ করে দিন । এক এ্যাম্পুল ইনজেকশন ওরাডেক্সন (Oradexon) শিরায় এবং এক এ্যাম্পুল ইনজেকশন এ্যাভিল (Avil) বা ফেনারগান (Phenargan) মাংসে দিন। তৎক্ষনাৎ ডাক্তারের শরণাপন্ন হউন।
- স্যালাইন দেবার সময় অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, সূঁচটি শিরায় প্রবেশ করেছে (রক্ত আসাবে)। অন্যথায় স্যালাইন দিলে চামড়ার নীচে স্যালাইন জমে স্থানটি ফুলে যাবে ও ব্যথা অনুভব হবে।
- কোন অবস্থাতেই কোন অস্থিসন্ধির (Joint) সংলগ্ন শিরায় স্যালাইন দেওয়া যাবে না। কারণ ঐ জয়েন্ট এর নাড়া চাড়ায় স্যালাইনের সূঁচ স্থানান্তরিত হতে পারে বা দুই দিকে শিরা ছিদ্র হয়ে যেতে পারে।
- লক্ষ্য রাখতে হবে স্যালাইন যাচ্ছে কিনা। কোথাও ব্লক হয়ে গেলে রক্ত জমাট বেধে স্যালাইন যেতে পারবে না (ফোঁটা পড়া বন্ধ হয়ে যাবে)। হাতে ব্যথা অনুভব হয়। সেটটি ব্লক হলে বাটার ফ্লাই নিডেল (সূঁচ) থেকে সেটটি খুলে নিয়ে রেগুলেটরের চাকা উপরের দিকে নিয়ে রানিং স্যালাইন সেটের নলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করতে হবে। বাটারফ্লাই সূঁচের পিছনের অংশ ক্যাপ লাগিয়ে বন্ধ করে রাখতে হবে যাতে বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। সেটের জমাট রক্ত বের হয়ে গেলে সেটটি আবার সূঁচের পিছনে সংযুক্ত করে স্যালাইন চালু কতে হবে এবং রেগুলেটর দিয়ে স্যালাইনের ফোঁটা নির্ধারণ করতে হবে।

  সূঁচের ভিতর ব্লক থাকলে একটি সিরিঞ্জে স্যালাইন নিয়ে বাটার ফ্লাই সূঁচের পিছনে সিরিঞ্জটি সংযুক্ত করে প্রচন্ড বেগে প্লাঞ্জার ঠেলে স্যালাইন প্রবেশ করতে হবে। এতে ব্লক সরে যাবে। অতঃপর স্যালাইন সেট সূঁচের পিছনে সংযুক্ত করে স্যালাইন চালু করতে হবে এবং রেগুলেটর দিয়ে স্যালাইনের ফোঁটা নির্ধারণ করতে হবে।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত/মাত্রাতিরিক্ত স্যালাইন শিরায় দিলে চোখের পাতা, মুখ ফুলে যাবে, কাশি ও শ্বাস কষ্ট হবে এমন কি ফুসফুসে পানি জমে যেতে পারে যা অত্যন্ত মারাত্বক। এমতাবস্থায় স্যালাইন দেওয়া বন্ধ করে তা খুলে ফেলুন।অতিসত্বর ডাক্তারের কাছে রেফার করুন। এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ইনজেকশন ফ্রুসেমাইড (Frusemide) শিরায় প্রয়োগ করে অতিরিক্ত পানি (প্রশ্রাবের মাধ্যমে) শরীরে থেকে রেব করে দেওয়া হয়।

পাঠ-৬
ঔষধের মাত্রা ও বিরুদ্ধ ইঙ্গিতসমূহ

ঔষধের মাত্রা (Dose)

ঔষধের মাত্রা বলতে বুঝায় কি পরিমাণ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করতে হবে। ঔষধের মাত্রা সাধারণভাবে নিম্নের এককগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

ক) ওজন - গ্রাম (gm) বা মিলিগ্রাম (mg)

খ) পরিমাণ (Volume) - মিলিলিটার (ml) বা কিউবিক সেন্টিমিটার (cc)

গ) ইউনিট (Unit)।

ঔষধের মাত্রা বা পরিমাণকে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো প্রভাবিত করে ঃ

১। দেহের ওজন - রোগীর ওজন যত কম হবে ঔষধের মাত্রাও তত কম হবে।

২। প্রয়োগের পথ - ট্যাবলেট অথবা ক্যাপসুলের তুলনায় ইনজেকশনের মাত্রা কম হয়।

৩। রোগের তীব্রতা - কখনও কখনও অসুখের তীব্রতা বেশী হলে বেশী মাত্রায় ঔষধ দরকার হয়।

৪। প্রয়োগের ব্যবধান - একই ঔষধ কম ব্যবধানে ব্যবহার করলে বেশী ব্যবধানের চেয়ে মাত্রা কম দরকার হয়।

৫। গর্ভাবস্থা - অনেক ঔষধ গর্ভাবস্থায় কম মাত্রায় দেয়া হয়।

যে সকল ঔষধ গর্ভবতী মহিলাকে কখনোই দেয়া যাবে না ঃ

- উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ভিটামিন- এ
- টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline)
- স্ট্রেপ্টোমাইসিন (Streptomycine)
- ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol)
- কোট্রাইমোক্সাজল (Cotrimoxazole)
- সিপ্রোফ্লোক্সাসিন (Ciporfloxacine)

গর্ভাবস্থায় পরিহার করা সবচেয়ে ভাল ঃ

- মেট্রোনিডাজল (Metronidazole)

- কৃমিনাশক (Antihelminthic)
- ডায়াজিপাম (Diazepam)

যে সকল ঔষধ এক বছরের কম বয়সী শিশুদের দেয়া উচিৎ নয় ঃ

- এসপিরিন (Aspirin)
- সালফোনামাইড (Sulphonamede)
- সিপ্রোফ্লোক্সাসিন (Ciprofloxacine)
- টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline)

৮ বৎসরের নীচে সকল শিশুর জন্য প্রযোজ্য নয় ঃ

- টেট্রাসাইক্লিন (Tetracycline)
- ক্লোরামফেনিকল (Chloramphenicol)

ঔষধের বিরুদ্ধ ইঙ্গিতসমূহ (Contraindication) হচ্ছে ঃ

১) **ঔষ্ধ এলার্জি (Drug Allergy) ঃ** কোন লোকের কোন ঔষধ সেবনের পরে এলার্জি হয়ে থাকলে পরবর্তী জীবনে ঐ ঔষধ আর কখনও ব্যবহার করা উচিৎ নয়। কারণ এটা খুবই মারাত্মক প্রতিক্রিয়া করতে পারে। এলার্জিক প্রতিক্রিয়া মাত্র একমাত্রা ঔষধ সেবনের পরই প্রকাশ পেতে পারে অথবা কয়েকমাত্রা ব্যবহারের পর প্রকাশ পেতে পারে।

২) **পেপটিক আলসার বা বুক জ্বালা পোড়া (Peptic Ulcer Or Heart Burn) ঃ** পেপটিক আলসারের ইতিহাস আছে এমন লোকের এসপিরিন বা করটিকোষ্টেরয়েড সেবন করা উচিৎ নয়। এই সব ঔষধ পাকস্থলীতে আলসার (ক্ষত) এমনকি পাকস্থলী ছিদ্র করে দিতে পারে।

৩) **যকৃতের অসুখ (Liver Disease) ঃ** যকৃত বিপাকের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ। যকৃতের অসুখে ঔষধের বিপাক ক্রিয়া দূর্বল হতে পারে। প্রশান্তিদায়ক ও নিদ্রাদায়ক ঔষধ যেমন- ডায়াজিপাম, ফেনোবারবিটন, লারগ্যাকটিল ইত্যাদি পরিহার করা উচিৎ। জন্মনিয়ন্ত্রণের খাবর বড়ি ও ইনজেকশন যকৃতের অসুখে (জন্ডিস) ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

৪) **কিডনির অসুখ (Kidney Disease) ঃ** যে সকল রোগীর কিডনির স্বাভাবিক ক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্থ রয়েছে, ঔষধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী দেখা যায়। এ সকল পরিস্থিতিতে প্রস্রাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ঔষধের নিঃসরণ এবং তাদের বিপাক কমে যায়। ঔষধের নির্দিষ্ট ব্যবহার উল্লেখ না থাকলে, যে সকল রোগীর কিডনির স্বাভাবিক ক্রিয়া ক্ষতিসাধিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ঐ ঔষধ প্রয়োগ করা উচিৎ নয়। কম ক্ষতিকারক বিকল্প ঔষধ বেছে নিতে হবে। কিডনির অসুখে সাধারণ ব্যবহৃত যে সকল ঔষধের মাত্রা কমিয়ে দেয়া প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে ঃ

- কো-ট্রাইমোক্সাজল

- এসপিরিন
- প্যাথেডিন/মরফিন
- প্রস্রাব বেশী হওয়ার ঔষধ- ফ্রুসেমাইড, স্পাইরানোল্যাক্টন
- ব্যাথা নাশক ঔষধ- প্যারাসিটামাল, আইবুপ্রোফেন, ইন্ডোমেথাসিন, ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম। এছাড়া কিছু এন্টিবায়োটিক কিডনির অসুখে ব্যবহার করা একেবারে নিষিদ্ধ, যেমন- জেনটামাইসিন, রফিকক্সিব, সেলেকক্সিব ইত্যাদি।

পাঠ-৭
ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার

ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার (Rational Use of Drugs) এর সংজ্ঞা

ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার বলতে বুঝায় রোগীরা তাদের ক্লিনিক্যাল চাহিদা অনুযায়ী সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করবে যেখানে ঔষধের প্রয়োগ হবে সঠিক মাত্রায়, পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত যা তাদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ করবে এবং যে, অর্থ ব্যয় হবে তা তাদের সমাজের (কমিউনিটি) জন্য ব্যয় সাশ্রয়ী (Cost effective)।

ঔষধ ব্যবহারের নীতিমালা ঃ

- সঠিক কারণ/নির্দেশ
- সঠিক ঔষধ
- সঠিক রোগী
- সঠিক প্রয়েগ, মাত্রা এবং সময়
- রোগীর সঙ্গে সঠিক যোগাযোগ
- সঠিকভাবে অনুসরণ (ফলো-আপ) এবং মূল্যায়ণ।

- **সঠিক কারণ/নির্দেশ**

  সঠিক ক্লিনিক্যাল কারণ যা সঠিক রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

- **সঠিক ঔষধ**

  প্রেসক্রিপশনকৃতি ঔষধ হতে হবে সবচেয়ে কার্যকর, নিরাপদ এবং ব্যয় সাশ্রয়ী।

- **সঠিক রোগী**

  রোগীকে সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করতে হবে যাতে রোগীর কোনো বিরুদ্ধ নির্দেশ না থাকে অথবা এমন কোনো সমস্যায় আক্রান্ত নয় যাতে নির্দিষ্ট ঔষধটি প্রয়োগের ফলে তার অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে।

- **সঠিক প্রয়োগ, মাত্রা এবং সময়**

  প্রেসক্রিপশন করার পূর্বে কিভাবে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে, কি মাত্রায় এবং কত সময় ধরে সেগুলো ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারণ করতে হবে।

- **রোগীর সঙ্গে সঠিক যোগযোগ**

  চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানা রোগীর অধিকার এবং এটি হতে হবে প্রেসক্রিপশন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

- **সঠিকভাবে অনুসরণ (ফলো-আপ) এবং মূল্যায়ণ**

চিকিৎসার আকাংখিত ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থাকতে হবে এবং রোগীকে জানাতে হবে। ফলো-আপ পরীক্ষার সময় তা মূল্যায়ণ করতে হবে।

ঔষধের অযৌক্তিক ব্যবহারের সমস্যা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঔষধের অযৌক্তিক ব্যবহার বংলাদেশেসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্র বা সেবাদানকারীগণ অকার্যকর, অনিরাপদ, ব্যয়বহুল ঔষধ সামগ্রীর যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্য সেবার মান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

ঔষধের অযৌক্তিক ব্যবহার বিভিন্নভাবে হতে পার। যেমন-

১। ঔষধ যেখানে দরকার নেই সেখানে দেয়া হচ্ছে

২। ভুল ঔষধ প্রদান

৩। অকার্যকর ও অনিরাপদ ঔষধের ব্যবহার

৪। একই ক্ষমতার ও একই রকম নিরাপদ কম দামী ঔষধ থাকা সত্ত্বেও দামী ঔষধের ব্যবহার

৫। সহজ প্রাপ্য নিরাপদ এবং কার্যকর ঔষধ ব্যবহারের ব্যর্থতা।

ব্যবস্থাপত্রের ধরনের উপর বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, সাধারণ ডায়রিয়া কিংবা ভাইরাসজনিত শ্বাসতন্ত্রের রোগ সমূহের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবার উপর এর মারাত্মক প্রভাবের কারণে ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার উৎসাহিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের এই সমস্যা এবং ঔষধ ব্যবহার উন্নতিকরণ সম্বন্ধে নিয়মিত তথ্য প্রদান করতে হবে।

ঔষধের অযৌক্তিক ব্যবহারের প্রভাব

ঔষধের অযৌক্তিক ব্যবহার স্বাস্থ্য সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে্ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের এ সম্বন্ধে ভালভাবে জানা উচিৎ। ক্ষতিকর প্রভাবগুলো হলো ঃ

১। **চিকিৎসা সেবার মানের উপর প্রভাবঃ**

ভুল চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র প্রদান বা প্রেসক্রিপশন এর কারণে সামগ্রীক চিকিৎসার উপর খারাপ প্রভাব পড়তে পারে। অপ্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগের কারণে ঔষধের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এন্টিবায়োটিকের অতিব্যবহারের ফলে প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাকটেরিয়ার অবির্ভাব ঘটে।

২। **ব্যয়ের উপর প্রভাব ঃ**

ঔষধের অতিরিক্ত ব্যবহারে (এমনকি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের বেলায়ও) অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় যার ফলে আর্থিক উৎসের অপচয় হয়।

৩। **মানসিক প্রভাব ঃ**

ঔষধের অতিরিক্ত ব্যবহার রোগীর মনে এই ধারণার জন্ম দেয় যে, তার যে কোনো শারীরিক সমস্যায় ঔষধের প্রয়োজন। এভাবে রোগীকে মানসিকভাবে ঔষধের উপর নির্ভরশীল করে তুলে।

ঔষধের অযৌক্তিক ব্যবহারের কারণসমূহ

ঔষধের অযৌক্তিক ব্যবহারের কারণসমূহ বেশ জটিল। এর উৎপত্তি স্বাস্থ্য সেবাদান প্রক্রিয়া, সেবা প্রদানকারী, রোগী, ঔষধ বিক্রয় উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি থেকে হতে পারে। এ সম্পর্কে নীচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

১। **স্বাস্থ্য সেবাদান প্রক্রিয়া ঃ** এর মধ্যে আছে ঔষধের সরবরাহে অনিশ্চয়তা, ঔষধের মজুদ, মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ, অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের অপ্রাপ্যতা, অনত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সহজপ্রাপ্যতা এই ব্যাপারগুলো স্বাস্থ্য সেবাদান প্রক্রিয়ার অযোগ্যতার সঙ্গে জড়িত।

২। **সেবা প্রদানকারী ঃ** সেবা প্রদানকারীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, ব্যক্তিগত লাভ ইত্যাদি ঔষধের ব্যবহারকেল প্রভাবিত করতে পারে। যিনি ঔষধ বিতরণ করেন তার উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, বিতরণ সামগ্রীর অভাব, অতিরিক্ত চাপ, সময়ের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে ঔষধের অযৌক্তিক ব্যবহার হতে পারে।

৩। **রোগী ঃ** অনেক ক্ষেত্রে রোগী নিজেই কোন ঔষধ দাবী করে থকে এবং সেবা প্রদানকারী রোগীকে সন্তুষ্ট করার জন্য দাবী পূরণে বাধ্য হন। এ কারণেও ঔষধের অযৌক্তিক ব্যবহার বেড়ে যায়।

৪। **ঔষধ বিক্রয় উৎসাহিতকরণ ঃ** বিক্রয় উৎসাহিতকরণের কারণে কোন কোন ঔষধের ব্যবহার বেড়ে যেতে পারে যেটি সাধারণতঃ বেসরকারী খাতে ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রে অনেক ভুল তথ্যও প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহার উৎসাহিতকরণের উপায়

ঔষধের অযৌক্তিক ব্যবহার মোকাবেলার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। পদক্ষেপগুলোকে মূলতঃ তিন ভগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১। **শিক্ষা কৌশল ঃ** এর মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, লিখিত তথ্য বিতরণ। কিন্তু এর প্রভাব অল্প এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না, যদি না এর সঙ্গে অন্যান্য পদক্ষে না নেয় হয়।

২। **ব্যবস্থাপনা কৌশল ঃ** এর মধ্যে আছে চিকিৎসা গাইড লাইন তৈরী করা এবং তা বাস্তবায়ন করা, স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্র গুলোতে ঔষধের ব্যবহার মনিটরিং এবং সুপারভিশন করা, সেবাদান কেন্দ্রসমীহের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক ঔষধের তালিকা প্রস্তুত করা।

৩। **নিয়ন্ত্রণ কৌশল ঃ** এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের সেবাপ্রদান কেন্দ্রে সবিধাসমূহ ঔষধ প্রদান সংখ্যা সীমিতকরণ এবং বাজার থেকে কোন কোন ঔষধ তুলে নেয়া যেতে পারে।

ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহারের জন্য কতিপয় নির্দেশ

ঔষধের কার্যকর, নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা উচিত ঃ

১। রোগীর সমস্যা সঠিকভবে নির্ণয়ের পরই তার ঔষধ ব্যবস্থাপত্রে লিখুন।

২। কখনো রোগকি সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যবস্থাপত্রে ঔষধ লিখবেন না। মাল্টিভিটামিন, ইনজেকশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সত্যিকার প্রয়োজন না থাকলে রোগীর দাবী অগ্রাহ্য করুন।

৩। একটি মাত্র ঔষধের চেয়ে একাধিক ঔষধের ব্যবহারে যদি উল্লেখযোগ্য সুবিধা না থাকে তবে একাধিক ঔষধ ব্যবহার পরিহার করুন।

৪। সব সময় জেনেরিক নামে ঔষধের নাম লিখবেন। ট্রেড নাম ব্যবহার করবেন না।

৫। ব্যাকটেরিয়া বিনাশী ঔষধ শুধুমাত্র ব্যকটেরিয়া জনিত ইনফেকশনে প্রয়োজন হয়। সামান্য কারণে যেমন শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগের মৃদু ইনফেকশনে ব্যকটেরিয়া বিনাশী ঔষধের ব্যবহার প্রযোজ্য নয়।

৬। রোগীর সংগে যোগাযোগের জন্য কিছু সময় ব্যয় করুন। এটি গ্রহীতাদের মধ্যে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সহায়তা করবে। রোগীকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যথাসম্ভব পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে বলুন।

৭। প্রত্যেক চিকিৎসার ক্ষেত্রেই কিছু খারাপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সম্ভাব্য উপকারটুকু যেন সম্ভাব্য অপকারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।

৮। অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের তালিকার বাইরের ঔষধ প্রদান থেকে বিরত থাকুন।

পাঠ-৮

পরামর্শ দান প্রক্রিয়া, প্রেসক্রিপশন লেখা এবং ঔষধ সেবনের নিয়ম

পরামর্শ দান প্রক্রিয়া

যখন রোগী স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর নিকট আসে তখন পরামর্শদান প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে হবে যাতে করে সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব হয় এবং যার ফলশ্রুতিতে সঠিক চিকিৎসা প্রদান করা যায়। প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে এটি করতে হবে। একটি সম্পূর্ণ পরামর্শদান প্রক্রিয়াতে নিম্নলিখিত ধাপগুলো থাকতে হবে ঃ

১। **ইতিহাস গ্রহণ**

এক্ষেত্রে রোগীর সমস্যা এবং উপসর্গ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য গ্রহণ করা হয়, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোগীর আস্থা অর্জন করা যায়।

২। **পরীক্ষা**

এর মধ্যে আছে শারীরিক পরীক্ষা যার মাধ্যমে অসুখের কারণে যেসব শারীরিক চিহ্ন/উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো অনুধাবন করা হয়। সেই সাথে ল্যবরেটরী পরীক্ষা এবং অন্যান্য পরীক্ষা, যেমন- এক্সরে, ইত্যাদির মাধ্যমে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়।

৩। **রোগ নির্ণয়**

রোগের ইতিহাস গ্রহণ এবং বিভিন্ন পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে একটি সঠিক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। যার উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

৪। **চিকিৎসা প্রদান**

চিকিৎসা ঔষধ দিয়ে কিম্বা বিনা ঔষধে অথবা দু'টোর সমন্বয়ে হতে পারে। বিনা ঔষধে চিকিৎসার মধ্যে আছে- আহার, বিশ্রাম, ব্যায়াম এবং অন্যান্য। যদি ঔষধের প্রয়োজন হয় সেটি ঔষধের কার্যকারিতা, কতটুকু নিরাপদ এবং ব্যয় বহুল এসবের বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করতে হবে।

৫। **রোগীকে তথ্য প্রদান**

রোগী অথবা তার আত্মীয়স্বজনকে রোগীর স্বাস্থ্য সমস্যা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রদান করতে হবে।

৬। **সঠিকভবে অনুসরণ (ফলো-আপ)**

চিকিৎসা প্রদানের পর রোগীকে ঔষধের কার্যকারিতা, পাশ্বা-প্রতিক্রিয়া, রোগীর উননইত বা অবনতি দেখার জন্য ফলো-আপ আসতে বলতে হবে।

ঔষধের প্রেসক্রিপশন লেখার ও ঔষধ সেবনের নিয়ম

ছোটদের কিভাবে ঔষধ দিবেন ?

সিরাপ বা তরল জাতীয় ঔষধ ছোট শিশুদের জন্য ভাল কিন্তু সাধারণত ঃ বড়ি বা ক্যাপসুলের চেয়ে ব্যয়বহুল। যদি সিরাপ জাতীয় ঔষধ না থাকে, আপনি নিজেই এই সিরাপ তৈরী করতে পারেন অথবা রোগীর আত্মীয়কে সিরাপ নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বানাতে বলুন ঃ

বড়িটি ভাল করে গুড়া করুন.....................ফুটানো পানি

চিনি বা মধু

অথবা ক্যাপসুলটি খুলুন

ফুটানো পানি ঠান্ডা করে সেই পানির সাথে ঔষধ গুড়া এবং চিনি বা মধু মিশান।
ঔষধ অতিরিক্ত তেতো হলে (যেমন - সিপ্রোফ্লোক্সাসিন, ক্লোরোকুইন ইত্যাদি) প্রচুর মধু বা চিনি মিশান।

গাইড লাইন ঃ বড়ি বা ক্যাপসুল থেকে সিরাপ বানানোর পদ্ধতি

বিঃ দ্রঃ - বড়ি বা ক্যাপসুল থেকে সিরাপ বানানোর সময় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঔষধের পরিমাণ বেশী হয়ে না যায়। নিশ্চিত হউন যে সবটুকু পাউডার মিশে গেছে। শিশুকে খাওয়ানোর পর যদি কিছুটা চামচে লেগে থাকে, তবে তার সাথে আরো পানি এবং মধু মিশান। তারপর এই দ্বিতীয় চামচ পূর্ণ ঔষধটিও শিশুটিকে খাওয়ান।

কিভাবে ঔষধের প্রেসক্রিপশন (Prescription) লিখিত হয় ?

প্রেসক্রিপশন হচ্ছে একজন রোগীর রোগ ও তাঁকে প্রদত্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা লিখিত দলিল। এটা রোগীর পরবর্তী অসুখের সময় অথবা উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতালে রেফার কারর সময় প্রমাণপত্র হিসেবে কাজ করে। প্রেসক্রিপশন স্পষ্টভাবে এবং বাংলায় লিখা উচিৎ যাতে করে ফার্মাসিষ্ট সঠিক ঔষধ দিতে পারে এবং নির্দেশ প্রদান করতে পারে। প্রেসক্রিপশন-এ নিম্নলিখিত অংশগুলো থাকা উচিৎ (নমুনা দেখুন)।

১) প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা

২) তারিখ

৩) রোগীর নাম, বয়স, লিঙ্গ। লোগেীর পূর্ণ ঠিকানাও লিখতে হবে

৪. প্রেসক্রিপশন/উপদেশ অংশ ঃ

ক) ঔষধের নাম ঃ ঔষধের ধরণসহ ঔষধের নাম লিখতে হবে, যেমন - ট্যাবলেট, সিরাপ বা ইনজেকশন ইতত্যিাদি। ঔষধের পরিমাণ (ওজনে) ও মোট ঔষধের পরিমাণও লিখতে হবে।

খ) ঔষধ সেবনের নির্দেশাবলী ঃ কতটুকু পরিমাণ ঔষধ খেতে হবে, কতক্ষণ পর পর খেতে হিবে এবিং আহারের আগে না পরে খেতে হবে, কতদিন খেতে হবে এগুলো পরিস্কারভাবে লিখতে হবে। রোগীকে কোন উপদেশ দেয়া হলে, ঔষধের নাম ও নির্দেশাবলীর নীচের অংশে লিখতে হবে।

৫) অসুবিধাসমূহ/লক্ষণসমূহ/রোগ নির্ণয় ঃ প্রেসক্রিপশন-এর বাম পাশে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রাপ্ত লক্ষণসমূহ এবং নির্ণিত রোগের নাম লিখতে হবে।

৬) স্বাক্ষর ও পদবী ঃ ডান পাশের নীচের অংশে যিনি প্রেসক্রিপশন দিলেন তার নাম ও পদবী লিখতে হবে।

রোগীর সঙ্গে যোগাযোগ

রোগীর সঙ্গে যোগাযোগ পরামর্শদান প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। রোগীকে তার স্বাস্থ্য সমস্যা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তীথ্য প্রদান স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর কর্তব্য। এর জন্য পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে হবে যাতে করে রোগীর সঙ্গে কার্যকরী যোগাযোগ তৈরী করা সম্ভব হয়। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে

রোগী যেন তার স্বাস্থ্যের জন্য ভাল এবং আকাংখিত অভ্যাস ও আচরণ গড়ে তুলে এবং রোগী যাতে চিকিৎসার নিয়মকানুন সঠিকভাবে মেনে চলে সেটি নিশ্চিত করা।

যে সকল তথ্য রোগীকে প্রদান করতে হবে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। রোগী যে স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে এর সম্ভাব্য কারণসমূহ, পরিণতি এবং যে সকল প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য, ঔষধ এবং বিনা ঔষধ উভয়ই এবং উভয় প্রকার চিকিৎসার উদ্দেশ্য রোগীকে পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৩। প্রতিটি ঔষধের নামসহ কিভাবে, কখন, কি পরিমাণ এবং কত সময় পর্যন্ত গ্রহণ করতে হবে তা রোগীকে জানাতে হবে। ঔষধের আকাংখিত থেরাপিউটিক ফল এবং অনাকাংখিত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগীকে তথ্য দিতে হবে।

৪। ফলো-আপ এবং মূল্যায়ণ সম্পর্কে তথ্য দিতে হবে। কোনো প্রকার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হলে, কি করতে হবে এবং ফলো-আপের জন্য কখন আসবে তা বলে দিতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, সঠিক তথ্য প্রদান রোগীর সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে।

"প্রেসক্রিপশন"এর নমুনা

ঠিকানা

তারিখ ঃ ১০-১০-২০১৫ ইং

রোগীর নাম ঃ সৌরভ বয়স ঃ ৮ বৎসর লিঙ্গ ঃ পুরুষ

ঠিকানা ঃ

গ্রাম ঃ কোকাদাইর ওয়ার্ড ঃ ৩

ডাকঘর ঃ বাটারা ইউনিয়ন ঃ সহবাতপুর

অসুবিধাসমূহ/লক্ষণসমূহ/রোগ নির্ণয়	**প্রেসক্রিপশন /উপদেশ**
প্রধান অসুবিধাসমূহ ঃ জ্বর- ৭ দিন ঢোক গিলতে ব্যথা -৩দিন **পরীক্ষার ফলাফল ঃ** নাড়ীর গতি - ১০০/মিনিট তাপমাত্রা - ১০২ডিগ্রী ফারেন হাইট শ্বাস-প্রশ্বাস - ২৪/মিনিট হৃৎপিন্ড - স্বাভাবিক ফুসফুস - স্বাভাবিক টনসিল - লাল, ফোলা ও পুঁজের বিন্দু দেখা যাচ্ছে। অন্যান্য তন্ত্র - স্বাভাবিক রোগ নির্ণয় - টনসিলের প্রদাহ (টনসিলাইটিস)	**Rx** ঃ ট্যাবলেট পেনিসিলিন ২৫০ মিঃ গ্রাঃ (২০) ১টা করে ৬ ঘন্টা পর পর খাওয়ার আগে ৫ দিন। **Rx** ঃ ট্যাবলেট প্যারাসিটামল-৫০০ মিঃ গ্রাঃ (০৬) অর্ধেক করে ৬ ঘন্টা পর পর ৩ দিন জ্বর বাগলা ব্যথা হলে ভরা পেটে। **উপদেশ ঃ** - প্রতি দুই ঘন্টা পর পর উষ্ণ লবন পানি দিয়ে গড়গড়া করবেন। - ঠান্ডা বা ফ্রিজিং খাবার নিষেধ। **স্বাক্ষর ঃ** .... **পদবী ঃ** ....

পাঠ-৯
ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, সংবেদনশীলতা ও এলার্জির ব্যবস্থাপনা

ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া (Side effect)

দেহে প্রতিটি ঔষধ একাধিক ক্রিয়া করে। স্বাস্থ্যকর্মী যে ক্রিয়াটি ঘটাতে চায় তাকে আরোগ্যকর ক্রিয়া (Therapeutic effect) বলে। যেমন ধরুন, মাথা ব্যথা কমানোর জন্য এসপিরিন ব্যবহার করা যেতে পারে- এটিই হচ্ছে আরোগ্যকর ক্রিয়া। তাছাড়াও এসপিরিনের অন্যান্য ক্রিয়া রয়েছে যেমন, এসপিরিন পাকস্থলীর ঝিল্লীকে উত্তেজিত করে, কোন কোন ক্ষেত্রে ছিদ্রও করে। একেই বলা হয় পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া।

কিছু কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আরামদায়ক অথবা উপকারী। আবার কিছু কিছু ক্ষতিকরও হতে পারে' যেগুলোকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বলা হয়। যখন এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া খুব মারাত্মক হয় এবং ঔষধের বিষক্রিয়া দেখা দেয় তখন ইহাকে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া (Toxic effect) বলা হয়। যদিও একই ঔষধের প্রতি বিভিন্ন রোগী বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া করে সেজন্য যে সমস্ত রোগী ঔষধ গ্রহণ করছেন তারা বমি বমি ভাব, বমি, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্যতে ভূগতে পারেন।

ঔষধের অতি সংবেদনশীলতা ও এলার্জি (Hypersensitivity and Drug Allergy)

কিছু কিছু মানুষ অন্যান্য মানুষের তুলনায় কোন নির্দিষ্ট ঔষধের প্রতি বেশী সংবেদনশীল হয়। এই সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া খব সামান্য হতে পারে, আবার ব্যাতিক্রম ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া মারাত্মক এমনকি জীবন বিপন্নও করতে পারে। যে সব ঔষধে এলার্জিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেগুলো হচ্ছে- পেনিসিলিন, সালফোনামাইড, স্ট্রেপটোমাইসিন এবং এসপিরিন ইত্যাদি।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কিছু মানুষ জানে যে নির্দিষ্ট ঔষধের প্রতি তার এলার্জি রয়েছে সেজন্য পেনিসিলিন, সালফোনামাইড, স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি দেয়ার আগে কমিউনিটি প্যারামেডিক-এর রোগীকে জিজ্ঞাসা করা উচিত কোন কোন ঔষধে তার এলার্জি হয় তা সে জানে কি না।

ঔষধ এলার্জির সাধারণ লক্ষণ-চিহ্নসমূহ ঃ

১। **মৃদু ও মাঝারি মাত্রার প্রতিক্রিয়া ঃ**

ক) ত্বকে চুলকানি, ফুসকুড়ি বা লালচে গুটি (Rash)

খ) শরীরের কোথাও কোথাও ফুলে যাওয়া। সাধারণত ঃ চামড়া, ঠোট ফুলে যাওয়া

গ) জ্বর

ঘ) বমি বমি ভাব ইত্যাদি।

২। **তীব্র প্রতিক্রিয়া ঃ**

ক) উপরে বর্ণিত লক্ষণ সমূহ

খ) শ্বাস কষ্ট

গ) রোগী শকে (Shock) যেতে পারে। শক (Shock) এর উপসর্গ হলো ঃ

- ঠান্ডা, ভেজা এবং ফ্যাকাশে চামড়া (ঠান্ডা ঘর্মাক্ত ত্বক)।
- নাড়ীর গতি দূর্বল ও দ্রুত হওয়া (নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১০০ এর বেশী হওয়া)।
- রক্তচাপ কমে যাওয়া (সিষ্টোলিক রক্তচাপ ১০০ মি.মি. মার্কারীর কম হওয়া)।

ঘ) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

ঔষধ এলার্জির ব্যবস্থাপত্র

ক) ঔষধ ব্যবহার বন্ধ করুন।

খ) মৃদু ও মাঝামাঝি মাত্রার প্রতিক্রিয়ায় ঃ এক এ্যাম্পুল প্রোমেথাজিন ইনজেকশনর মাংসপেশীতে দিন। তারপর আরও কয়েকদিন প্রোমেথাজিন বড়ি রোজ তিনবার করে মুখে খেতে দিন।

গ) তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ঃ ইনজেকশন এড্রিনালিন অর্ধেক এ্যাম্পুল (১/২ সি.সি) ধীরে ধীরে মাংসপেশীতে দিন, প্রয়োজনে ১০ মিনিট পর একই পরিমাণ আবারও দিতে পারেন। শিশুদের বেলায় ঔষধের মাত্রা আনুপাতিক হারে কম হবে।

ঘ) রোগীর শকের চিকিৎসা করুন এবং তীব্র প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে রোগীকে সঙ্গে সঙ্গে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অথবা কাছাকাছি কোন এমবিবিএস ডাক্তারের কাছে রেফার করুন।

পাঠ-১০
এন্টিবায়োটিক ঔষধের পরিচিতি ও ব্যবহার বিধি

জীবাণুনাশক ঔষধ বা এন্টিবায়োটিক (Antibiotic)

এন্টিবায়োটিক হচ্ছে এক ধরণে বিশেষ পদার্থ যা জীবন্ত জীবাণু থেকে তৈরী হয় বা আহরণ করা হয় এবং অণ্য জীবাণুকে ধ্বংস করে বা জন্ম-বৃদ্ধি রোধ করে। যখন সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, এন্টিবায়োটিক খুবই কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ ্ষধ হিসাবে কাজ করে।

এন্টিবায়োটিক-কে দুই ভাগে করা যায়। যথা-

১) অল্প ক্ষমতার (Narrow Spectrum) এন্টিবায়োটিক ঃ

যেসব এন্টিবায়োটিক সামান্য কয়েকটি জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী তাদেরকে অল্প ক্ষমতার এন্টিবায়োটিক বলা হয়। যেমন ঃ পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি।

২) বেশী ক্ষমতার (Broad Spectrum) এন্টিবায়োটিক ঃ
যেসব এন্টিবায়োটিক নানা ধরণের জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী তাদেরকে বেশী ক্ষমতার এন্টিবায়োটিক বলা হয়। যেমন ঃ এমক্সিসিলিন, সেফালেক্সিন, সেফট্রিয়াকজোন, টেট্রাইক্লিন, কোট্রাইমোক্সাজল ইত্যাদি।

এন্টিবায়োটিকের কার্য ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে উহাকে আবার অন্যভাবে শ্রেণীবভিক্ত করা যায়। কিছু এন্টিবায়োটিক জীবাণুকে মেরে ফেলে অথবা ধ্বংস করে। এগুলোকে জীবাণুনাশক (Bacteriocidal) এন্টিবায়োটিক বলা হয়। আবার কিছু এন্টিবায়োটিক জীবাণুর জন্মবৃদ্ধিকে কমিয়ে দেয় এবং জীবাণুর কার্যকারিতা হ্রাস করে। এগুলোকে জীবাণু বৃদ্ধিরোধক (Bacteriostatic) এন্টিবায়োটিক বলে।

এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের নিয়ম ঃ

- সঠিক রোগ নির্ণয়ের পরই কেবলমাত্র এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।
- এন্টিবায়োটিক নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে-বেশীও নয় আবার কমও নয়।

- জ্বর ও অন্যান্য সংক্রমণের লক্ষণগুলো দূর হওয়ার কমপক্ষে দুইদিন পর পর্যন্ত এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে (সাধারণ কোর্স বা মেয়াদ ৫-৭ দিন)।
- যতক্ষণ সম্ভব এন্টিবায়োটিক মুখে খাওয়াতে হবে। একেবারে প্রয়োজন না হলে এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন ব্যবহার করা যাবে না।
- কোন এন্টিবায়োটিকে যদি ফসকুড়ি, চলকানী বা ওষধ প্রতিক্রিয়ার অন্যান্য লক্ষণ দেখা দেয়, তৎক্ষনাৎ ঔষধ বন্ধ করে দিতে হবে এবং এটা আর কখনোই ঐ রোগীর জন্য ব্যবহার করা যবে না। রোগীকে বলতে হবে যে ঐ ঔষধের প্রতি তার এলার্জি রয়েছে। যে ঔষধের প্রতি ঐ রোগীর এলার্জি রয়েছে তার নাম রোগীকে বলে দিতে হবে।
- যদি সংক্রমণকে পেনিসিলিন বা অন্য কোন অল্প ক্ষমতার এন্টিবায়োটিক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে বেশী ক্ষমতার এন্টিবায়োটিক (সেফালেক্সিন, সেফট্রিয়াকজোন ইত্যাদি) ব্যবহার করা যাবে না।
- রোগীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে তার কোন ঔষধের প্রতি এলার্জি আছে কি না। কোন ঔষধে এলার্জি থাকলে সেই ঔষধ দেয়া পরিহার করতে হবে।
- গর্ভবতী মহিলাকে টেট্রাসাইক্লিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরামফেনিকল, সালফোনামাইড ও সিপ্রোফ্লোক্সাসিন দেয়া যাবে না এবং ৮ বৎসরের নীচের শিশুদের টেট্রাসাইক্লিন দেয়া যাবে না।
- একটি সংক্রমণের চিকিৎসার জন্য সাধারণতঃ শুধুমাত্র একটি এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে।

এন্টিবায়োটিক কাজ না হলে কি করতে হবে ?

এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে সাধারণ সংক্রমণের বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এক বা দুই দিনের মধ্যেই অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। যদি এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে রোগীর অসুখের কোন উন্নতি না হয় তবে তার কারণ নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

- রোগ চিনতে হয়তো ভুল হয়েছে। হয়তো ভুল ঔষধ ব্যবহার করা হয়েছে। সঠিক রোগ নির্ণয়ের চেষ্ট করতে হবে এবং সঠিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে অথবা রোগীকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রেফার করতে হবে।
- ব্যবহৃত এন্টিবায়োটিকের মাত্রা সঠিক নাও হতে পারে। এ ব্যাপারে খোঁজ (Check) করতে হবে।
- যে জীবাণুর জন্য ঔষধ ব্যবহার করা হয়েছে সেই জীবাণু এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধক (Resistant) হয়ে উঠতে পারে। এক্ষত্রে বিকল্প কোন এন্টিবায়োটিক দিয়ে চেষ্টা করতে হবে অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রেফার করতে হবে।
- রোগ যদি গুরুতর আকার ধারণ করে অথবা খারাপের দিকে যায়, তবে রোগীকে অতিসত্বর নিকটস্থ হাসপাতালে রেফার করতে হবে।

পাঠ- ১১

স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনের পূর্বে ব্যবহৃত ঔষধের পরিচিতি

স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনের পূর্বে ব্যবহৃত ঔষধসমূহ হচ্ছে ঃ

১) ডায়াজিপাম (Diazepam)

২) প্রোমেথাজিন (Promethazine)

৩) প্যাথেডিন হাইড্রোক্লোরাইড (Pathedine Hydrochlorid) বা পেন্টাজসিন (Petazocin)

৪) এট্রোপিন (Atropine)

৫) স্থানীয় অনুভূতিনাশক ঔষধ (Local Anaesthetic) ঃ লিগনোকেইন (Lignocanie)

১) ডায়জিপাম (Diazepam)

ডায়াজিপাম উদ্বেগ ও উত্তেজনা উপশম করে, মাংসপেশীকে শিথিল করে, খিঁচুনী নিয়ন্ত্রণ করে এবং বেশী মাত্রা প্রয়োগে প্রশান্তি এবং ঘুম আনে।

সরবরাহঃ প্রতি ট্যাবলেট ৫ মিঃ গ্রাঃ

ঃ প্রতি ইনজেকশন ১০ মিঃ গ্রাঃ

ব্যবহার ঃ উদ্বেগ এবং উত্তেজনা প্রশমনের জন্য

ঃ ছোট অপারেশনের পূর্বে প্রশান্তিদায়ক হিসাবে

ঃ ধনুষ্টংকারের খিঁচুনী নিয়ন্ত্রণের জন্য।

মাত্রা ঃ অবস্থার তীব্রতা ভেদে একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের ২-৫ মিঃ গ্রাঃ ট্যাবলেট পতিদিন দুই থেকে তিন বার। স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনের ৪৫ মিনিট পূর্বে ১০ মিঃ গ্রাঃ ইনজেকশন (৭৫ পাউন্ডের নীচে ওজনধারী রোগীর ক্ষেত্রে ৫ মিঃ গ্রাঃ) মাংসে দেয়া হয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ ঘুম ঘুম ভাব, শান্ত হয়ে যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা ইত্যাদি পরবর্তী দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকতে পারে।

২। প্রোমেথাজিন হাইড্রোক্লারাইড (Promethazine Hydrochloride)

ইহা একটি শক্তিশালী, দীর্ঘক্ষণ কার্যকরী এন্টিহিষ্টামিন যা এলার্জি ও বমির বিরুদ্ধে কাজ করে ও ঘুম আনয়ন করে।

সরবরাহঃ প্রতি ট্যাবলেট ১০ মিঃ গ্রাঃ এবং ২৫ মিঃ গ্রাঃ

প্রতি চা চামচ ৫ মিঃ গ্রাঃ

প্রতি এ্যাম্পুল ইনজেকশন ৫০ মিঃ গ্রাঃ

ব্যবহার ঃ এলার্জিক অবস্থাসমূহ, যেমন-

- চুলকানী
- ফুসকুড়ি সহ ফুলে যাওয়া
- ঔষধের এলার্জি বা প্রতিক্রিয়া
- কীট পতঙ্গের কামড়
- ত্বকের এলার্জিক ফুসকড়ি।

মাত্রা ঃ

বয়স	০-১ বৎসর	১-৫ বৎসর	৫-১২ বৎসর	পূর্ণ বয়স্ক
ট্যাবলেট ও সিরাপ	৩-৫ মিঃ গ্রাঃ	৫-১০ মিঃ গ্রাঃ	১০-২৫ মিঃ গ্রাঃ	২৫-৫০ মিঃ গ্রাঃ
ইনজেকশন	৩-৫ মিঃ গ্রাঃ	৫-১০ মিঃ গ্রাঃ	১০-২৫ মিঃ গ্রাঃ	২৫-৫০ মিঃ গ্রাঃ

স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনের পূর্বে সাধারণত ঃ ১২.৫ মিঃ গ্রাঃ প্রোমেথাজিন ইনজেকশন শিরায় ব্যবহার করতে হয়।

প্রয়োগ পথ ঃ ইনজেকশন ধীরে ধীরে শিরায় অথবা মাংসপেশীতে দিতে হবে।

দিনে কতবার খাওয়াতে হবে ঃ সাধারণতঃ দিনে দুই থেকে তিনবার।

কতদিন ব্যবহার করতে হবে ঃ ভাল না হওয়া পর্যন্ত।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ সামান্য মাথা ব্যথা, ঘুম ঘুম ভাব এবং ঘুম হতে পারে।

যাদেরকে দেয়া যাবে না ঃ গাড়ী চালক বা যারা যন্ত্র চালনা করেন।

৩) এট্রোপিন (Atropine)

এট্রোপিনের বিবিধ ব্যবহার রয়েছে। যেমন-

ক) এট্রোপিন রসগ্রন্থি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির (Endorine Gland) নিঃসরণ, যেনম - মুখের লালা, পাকস্থলী ও অন্ত্রের রস, অশ্রু, ঘাম ইত্যাদি কমিয়ে দেয়।

সরবরাহ ঃ প্রতি এ্যাম্পুল ইনজেকশন ০.৬ মিঃ গ্রাঃ

ব্যবহার ঃ রসক্ষরণ বন্ধ করার জন্য।

ঃ অজ্ঞান করার সময় (During Anaesthesia), লালাগ্রন্থি ও বায়ুনালীর রসক্ষরণ কমানোর জন্য, পাকস্থলীর রস কমানোর জন্য।

মাত্রা ঃ সাধারণ মাত্রা এক এ্যাম্পুল (০.৬ মিঃ গ্রাঃ)।

ঃ টিউবেকটমী করার সময় রোগীর ওজন ৭৫ পাউন্ডের কম হলে অর্ধেক মাত্রা ব্যবহার করতে হবে।

প্রয়োগ পথ ঃ শিরায় দিতে হবে।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ মুখ শুকিয়ে যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, নাড়লি গতি বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি হতে পারে।

৪) প্যাথেডিন হাইড্রোক্লোরাইড (Pathedine Hydrochloride)

প্যাথেডিন বিশেষ করে একটি শক্তিশালী ব্যথানাশক ঔষধ। এটা নিদ্রাকারক এবং শ্বাসনালী ও অন্ত্রনালীর মসৃন মাংসপেশীর শিথিলতা এনে দেয়।

সরবরাহ ঃ প্রতি এ্যাম্পুল ইনজেকশন ৫০ মিঃ গ্রাঃ এবং ১০০ মিঃ গ্রাঃ।

ব্যবহার ঃ স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশনে ব্যথানাশক হিসাবে এবং যে কোন তীব্র ব্যথার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

প্রয়োগ ঃ দু'টো অর্ধেক মাত্রায় ভাগ করা হয়। ধীরে ধীরে শিরায় অথবা মাংসপেশীতে দিতে হবে।

মাত্রা ঃ পূর্ণ বয়স্কদের জন্য ৫০-১০০ মিঃ গ্রাঃ। স্থায়ী পদ্ধতি অপারেশন এর পূর্বে প্যাথেডিন ২৫ মিঃ গ্রাঃ বা

পেন্টাজসিন ৩০ মিঃ গ্রাঃ শিরায়। ৭৫ পাউন্ডের নীচে ওজনধারী রোগীদের ক্ষেত্রে ডোজ কমাতে হবে।

পাশ্ব-প্রতিক্রিয়া ও জটিলতা ঃ

১) মাথা ঝিম ঝিম করা, বমি বমি ভাব, বমি, ঘাম হওয়া, মাথা ব্যথা, দূর্বলতা এবং শুষ্ক মুখ প্রভৃতি হতে পারে।

২) বেশী মাত্রায় দিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কমে যেতে পারে, খিঁচুনী এবং সংজ্ঞাহীন হতে পারে। নিয়মিত ব্যবহারে প্যাথেডিনের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হতে পারে।

সাবধানতা ঃ কেবলমাত্র জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে।

৫) স্থানীয় অনুভূতিনাশক ঔষধ (Local Anaesthetic)

স্থানীয় অনুভূতিনাশক ঔষধ স্নায়ুর প্রান্ত থেকে ব্যথা মাথায় পরিবহনে বাধা দেয়। ইনজেকশনের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করানো হলে এসব ঔষধ তুলনামূলকভাবে কম জায়গা থেকে ব্যথার অনুভূতি বিলোপ করে। বাজারে লিগনোকেইন, লিডোকেইন, জাইলোকেইন ইত্যাদি নামে এ ঔষধ পাওয়া যায়।

লিগনোকেইন (Lignocaine)

লিগনোকেইন সবচেয়ে সন্তোষজনক এবং বহুল ব্যবহৃত স্থানীয় অনুভূতিনাশক ঔষধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি তাড়াতাড়ি, তীব্র, দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যাপক অনুভূতিনাশক ফলাফল বিস্তার করে। এই অনুভূতি বিলোপ ৬০-৯০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

সরবরাহ ঃ এটা ১-২% ইনজেকশন হিসাবে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ সাধারণ শৈল্য চিকিৎসায় ঃ

- টিউবেকটমী অপারেশন
- ভ্যাসেকটমী অপারেশন।

মাত্রা ঃ সাধারণ মাত্রা ৩ মিঃ গ্রাঃ/কে.জি সর্বাধিকমাত্রা ৫ মিঃ গ্রাঃ/কেজির বেশী নয়।

ঃ পূর্ণ বয়স্ক মাত্রা কখনও ২০০ মিঃ গ্রাঃ বা ২০ মিঃ লিঃ (যদি ১% সলিউশন হয়) এবং ১০০মি.গ্রা. বা ১০ মি.লি. (যদি ২% সলিউশন হয়) মাত্রা অতিক্রম করবে না।

প্রয়োগ পথ ঃ চামড়ার নীচে (S/C) দিতে হয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ লিগনোকেইনের জটিলতা সাধারণতঃ অতি মাত্রা, ঔষধের

প্রতি অস্বাভাবিক সংবেদনশীলতা এবং ঔষধ রক্ত নালীতে প্রয়োগের ফলে হয়ে থাকে।

ঃ আপনি যদি প্রাথমিক মৃদু লক্ষণগুলোর প্রতি সজাগ হন, গুরুতর জটিলতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই এগুলো চিকিৎসা করতে সক্ষম হবেন। সেজন্য পরিবর্তীত অনুভব শক্তি লোপ পাওয়া (Paresthesia), মৃদুটান (Twitching) বা ঝাকুনি লক্ষ্য করবেন। এই অবস্থায় ডায়াজিপাম ইনজেকশন শিরায় দিলে খিঁচুনী এবং সম্ভবতঃ হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রতিহত করা যায়। অতিমাত্রা শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে। ঔষধ রক্ত নালীতে ভুলবশতঃ প্রয়োগ করলে প্রথমেই খিঁচুনী দেখা

দেয়। ডায়াজিপাম আগে প্রয়োগ করলে এই লক্ষণগুলো কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সাবধানতা ঃ কখনো অনুমোদিত মাত্রার বেশী ব্যবহার করা যাবে না।

পাঠ- ১২

কমিউনিটিতে ব্যবহৃত ঔষধসমূহ

১.প্যারাসিটামলঃ

একটি সুলভ ঔষধ যা সচরাচর জ্বর ও ব্যথা উপসমে সেবন করা হয়। এটি যুগপৎ "অ্যানালজেসিক" এবং "অ্যান্টিপাইরেটিক" শ্রেণীর ঔষধ। এর অন্য নাম অ্যাসিটামিনোফেন। সাধারনত ৫০০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট বা ক্যাপলেট আকারে এটি বাজারজাত করা হয়। এ ছাড়াও এটি ট্যাবলেট, সিরাপ, সাসপেনশন ও সাপোজিটর ফর্মে পাওয়া যায়। প্যারাসিটামল একটি "ওভার দি কাউন্টার মেডিসিন" অর্থ্যাৎ ডাক্তারের চিকিৎসাপত্র ব্যাতিরেকেই এটি কিনতে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ

জ্বর, মাথা ব্যথা, অস্টিওআর্থারাইটিস, পশ্চাৎদেশে ব্যথা, দাঁতের ব্যথা ও ঠান্ডা/ফ্লু ব্যথায় প্যারাসিটামল ব্যবহার করা হয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

ত্বকে ফুসকুড়ি, ফুঁসকুড়ি, হাঁপানি, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি দেখা যায়।

সাবধানতা ঃ

লিভারের রোগ আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে প্যারাসিটামল ব্যবহার করার সময় সর্তক থাকতে হবে।

২. মেট্রোনিডাজল ঃ

মেট্রোনিডাজল একটি অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিপ্রোটোজোয়াল জাতীয় ঔষধ। এটি বিশ্বের সর্বত্র পাওয়া যায়। মেট্রোনিডাজল বড়ি ৪০০ মিলিগ্রাম হিসাবে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ

আমাশয়, অতিরিক্ত সাদাস্রাব, জরায়ুতে প্রদাহ বা ইনফেকশন, লিভার অ্যাবসেস, এ্যানোরবিক ইনফেকশনে মেট্রোনিডাজল ব্যবহার করা হয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

১. বমি বমি ভাব বা বমি, ২. অরুচি, ৩. ধাতব স্বাদ বা মেটালিক টেষ্ট ৪. কোষ্টকাঠিন্য হতে পারে।

সাবধানতা ঃ

গর্ভাবস্থায় এই মেডিসিনটি একদম ব্যবহার করা যাবে না।

৩. এলবেনডাজল ঃ

এলবেনডাজল কৃমিনাশক ঔষধ। এলবেনডাজল একক মাত্রার ৪০০ মিলিগ্রাম ঔষধ শিশু বা বড়দের কৃমিনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার ঃ

এলবেনডাজল ফিতা কৃমি, গুঁড়া কৃমি, বক্র কৃমি, গোল কৃমি নিধনে সমানভাবে কার্যকর।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

বমি বমি ভাব বা বমি, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরানো, চুল পড়া, পেটব্যথা হতে পারে।

সাবধানতা ঃ

গর্ভাবস্থায় প্রথম ট্রাইমেষ্টারে এই ঔষধটি একদম ব্যবহার করা যাবে না।

৪. ক্লোরফেসিরামিন ঃ

ক্লোরফেসিরামিন হলো অ্যান্টি অ্যালার্জিক ঔষধ। এটি ট্যাবলেট ও সিরাপ ফর্মে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ

চুলকানি, সাধারণ সর্দি-কাশি, পোক মাকরের কামড়ের কারনে চুলকানি, মোশন সিকনেস বা ভ্রমনকালে বমি বমি ভাব, এলার্জি জনিত কারনে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, রাইনাইটিস, ছুলি প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

তন্দ্রাচ্ছন্ন বা ঘুম ঘুম ভাব বা বমি, দুর্বল লাগা, মুখ ও গলা শুকিয়ে যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা।

সাবধানতা ঃ

গ্লুকোমা রোগী ও ২ মাসের কম বয়সী শিশুদের এই ঔষধ দেয়া যাবে না। এই ঔষধটি একদম ব্যবহার করা যাবে না। ঘুম ঘুম ভাব হয় বিধায় গাড়ি চালানো উচিত নয়।

৫. কো-ট্রাইমোক্সাজল ঃ

ব্যবহার ঃ

বিভিন্ন ধরণের সংক্রমণ। শ্বাসতন্ত্র (যেমন-নিউমোনিয়া), মুত্রতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র (যেমন-পাতলা পায়খানা), ত্বক ইত্যাদির সংক্রমণ। এছাড়াও টাইফয়েড ও প্যারা টাইফয়েড জ্বর ও গনোরিয়া ইত্যাদি।

সেবন মাত্রা ঃ

২ মাস থেকে ৬ মাস বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে **১**টি বড়ি পানিতে গুলিয়ে **১২** ঘন্টা পরপর বা দিনে ২-৫ বার সেব্য। ৬ মাস থেকে **১৬** মাস বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ২টি বড়ি পানিতে গুলিয়ে **১২** ঘন্টা পরপর বা দিনে ২-৫ বার সেব্য।

যে ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না

১. গর্ভাবস্থায়
২. অকৃতকর কিডনী ও লিভার সম্যসা।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, ক্ষুধামন্দা, এলার্জির কারনে ত্বকে চুলকানি বা দাগ হওয়া ।

সাবধানতা ঃ কোনভাবে এটি খাবার যে নিয়ম তার ব্যতিক্রম করা যাবে না। যে কয়দিন যেভাবে খেতে বলা হয়েছে সে কয়দিন সেভাবে খেতে হবে।

৬. বেনজয়িক স্যালিসাইটিক এসিড মলম ঃ

এটি ৬% বেনজয়িক এসিড এবং ৩% বেনজয়িক স্যালিসাইটিক এসিড এর সংমিশ্রণে তৈরী অয়েন্টমেন্ট।

ব্যবহার ঃ

দাদ ও অন্যান্য ছত্রাকের সংক্রমণ।

ব্যবহারের নিয়ম ঃ দিনে ২-৩ বার আক্রান্ত স্থানে ২-৪ সপ্তাহ ব্যবহার করতে হবে।

লাগানের পূর্বে আক্রান্ত স্থান হালকা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে এবং পরিস্কার কাপড় দিয়ে মুছে নিতে হবে।

যেসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না ঃ

কাটা স্থানে, চোখ, মুখগহবর, যোনিপথ।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

ব্যবহারের স্থানে জ্বালাপোড়া, প্রদাহ বা ইনফ্লামেশনের কারনে আক্রান্ত স্থান লালচে বর্ণ হওয়া, চুলকানি।

সাবধানতা ঃ

যদি নির্দিষ্ট এ ঔষধটিতে এলার্জি বা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হয় তাহলে এটি ব্যবহার করা যাবে না। শুধুমাত্র বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য।

নিচে কিছু এন্টিবায়োটিক ব্যবহার ও ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ

১.এমোক্সিসিলিন (আইএনএন) ঃ

এমোক্সিসিলিন (আইএনএন), পূর্বেকার অ্যামোক্সিসিলিন (বিএনএন) এবং সংক্ষেপে এমোক্স হচ্ছে একটি মধ্যম পরিসরের (moderate-spectrum) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী বিটা-ল্যাক্টাম এন্টিবায়োটিক ঔষধ। এমোক্সিসিলিন সাধারনত ব্যাকটেরিয়া জাতীয় সংক্রমণের জন্য দায়ী জীবানুর উপর ব্যবহার করা হয়। মুখে খাওয়া অন্য বিটা-ল্যাক্টাম এন্টিবায়োটিক ঔষধ শ্রেণীর মধ্যে এটি প্রথম পছন্দের (drug of choice) তালিকায় পড়ে। এমোক্সিসিলিন শিশুদের জন্য একটি অন্যতম সাধারণ নির্দেশিত এন্টিবায়োটিক ঔষধ। এটি সাধারনত ট্যাবলেট, ক্যাপসুল সাসপেনশন ও চিউয়েবল ট্যাবলেট হিসাবে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ

১. নিউমোনিয়া
২. ত্বক সংক্রমণ
৩. মুত্রনালীর সংক্রমণ
৪. ক্ল্যামাইডিয়া সংক্রমণ
৫. স্ট্রেপটোকক্কাস সংক্রমণ
৬. এ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ
৭. একিউট ওটাইটিস মিডিয়া

এছাড়াও আরও কিছু সংক্রমণে এমোক্সিসিলিন ব্যবহার করা হয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো অন্য বিটা-ল্যাক্টাম এন্টিবায়োটিক ঔষধের মত যেমন-বমিভার, বমি, ছোট ছোট রক্ত ফুসকুড়ি, এমনকি ডায়ারিয়াও হতে পারে। দুর্লভ কিন্তু কিছু কিছু কারণ যেমন- মানসিক পরিবর্তন, আলোকসংবেদনশীলতা জনিত মাথা ব্যথা,ঘুম কম হওয়া, বিভ্রান্তি, উদ্বিগ্নতা, আলোক ও শব্দ সংবেদনশীলতা এবং অপরিস্কার চিন্তা ইদ্যাদি ক্ষেত্রে রোগীর বিবরনী পাওয়া যায়। এই সম্যসাগুলো দেখা দিলে তাৎক্ষনিক চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

২.ডক্সিসাইক্লিন

ডক্সিসাইক্লিন একটি বড় পরিসরের (broad-spectrum) ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী টেট্রাসাইক্লিন এন্টিবায়োটিক। সাধারনত ব্যাকটেরিয়া ও প্রোটোজোয়া সংক্রমণের চিকিৎসায় ডক্সিসাইক্লিন ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার ঃ

১. ক্ল্যামাইডিয়া সংক্রমণ

২. ব্রণ

৩. অন্ত্রের সংক্রমণ (intestinal infections)

৪. চোখ সংক্রমণ

৫. মাড়ির রোগ

৬. গনোরিয়া

৭. মুত্রনালীর সংক্রমণ

৮. কলেরা ও

৯.সিফিলিস

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো অন্য এন্টিবায়োটিক ঔষধের মত যেমন-বমিভার, বমি, ছোট ছোট রক্ত ফুসকুড়ি, ডায়ারিয়া, ক্ষুধামন্দা, মাথা ঘোরা, দ্রুত হৃদস্পন্দন, অস্বস্থি অনুভুতি। জ্বর, মাথা ব্যথা, চোখ ও চামড়া হলুদ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

২.অ্যাজিথ্রোমাইসিন ঃ

এন্টিবায়োটিকটি ম্যাক্রোলাইভ গোত্রের ঔষধ। এটি অনেক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী। এটা সাধারনত ৫০০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট আকারে বাজারে পাওয়া যায়।

ব্যবহার ঃ

ফুসফুস, ত্বক, কান ও যৌনঘটিত রোগের সংক্রমণে ঔষধটি বহুল ব্যবহৃত। এছাড়াও গ্যাস্ট্রিক আলসার ও ডিওডেনাল আলসারেও ব্যবহার করা হয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে আছে বমিভার, বমি, ঘন ঘন পায়খানা, পেটে অস্বস্থি, দুর্বলতাবোধ, কানে শো শো শব্দ, মাথা ঘোরা ইত্যাদি। তবে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার আছে যা দেখা দিলে অবশ্যই ডাক্তারের পরার্মশ

নিতে হবে। যেমন- ডায়ারিয়া ও ডায়ারিয়ার মত পাতলা পায়খানা, মাথা ব্যথা, বুক ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা, অজ্ঞান হওয়ার মতো অনুভুতি হওয়া, বমিবমি ভাব, গলা ব্যথা, ত্বকে ফুসকুড়ি ইত্যাদি।

বিঃদ্রঃ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোন ঔষধ খাওয়া উচিৎ নয়। আর এন্টিবায়োটিক খাওয়ার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরার্মশ নিতে হবে।

অধ্যায় ৩ ঃ

মাইক্রোবায়োলজি বা অণুজীব বিজ্ঞান

পাঠ-১
মাইক্রোবায়োলজি ঃ সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

মাইক্রোবায়োলজি এর সংজ্ঞা

বিজ্ঞানের যে শাখায় অণুজীব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে অণুজীব বিজ্ঞান বা মাইক্রোবায়োলজি (Microbiology) বলে।

ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তর অণুজীব সম্বন্ধে সর্ব প্রথম আধুনিক ধারণা দেন।

অণুজীব হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু যা খালি চোখে দেখা যায় না। শুধুমাত্র অনুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহয্যে দেখা যায়। আমাদের চার পাশে অনেক প্রকার অণুজীব রয়েছে। এদরে মধ্যে কিছু সংখ্যক আমদের জন্য ক্ষতিকারক। আবার কিছু আমাদের উপকারও করে। যে সকল অণুজীব রোগ সৃষ্টি করে তাদেরকে প্যাথজেনিক (Pathogenic) জীবাণু বলে।

অনুজীবের প্রকারভেদ

আকার আকৃতি ও অন্যান্য গুণাবলীর ভিত্তিতে অনুজীবকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায় ঃ

১. ইষ্ট এবং ছত্রাক (Yeast and Fungus)
২. প্রোটোজোয়া (Protozoa)
৩. ব্যাকটেরিয়া (Bacteria)
৪. রিকেটসিয়া (Rickettsia)
৫. ভাইরাস (Virus)

১। ঈষ্ট এবং ছত্রাক (Yeast and Fungus) ঃ

ঈস্ট একপ্রকার এককোষীর প্রাণী। এদের আকার ক্ষুদ্র (৫-১০ মাইক্রন) এবং এরা শাখা প্রশাখাযুক্ত। কিছু কিছু ছত্রাক সুতার মত পেচানো থাকে।

২। প্রোটোজোয়া (Protozoa) ঃ

প্রোটোজোয়া এক ধরনের এককোষীর জীবাণু। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এরা ব্যাকটেরিয়া হতে বড় কিন্তু অণুবিক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। কিছু সংখ্যক প্রোটোজোয়া মানুষের জন্য ক্ষতিকারক। ম্যালেরিয়া ও আমাশয় প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ। আরো কয়েক প্রকার প্রোটোজোয়া, যথা- জিয়ারডিয়া, ট্রাইকোমাস ভ্যাজাইনামিস ও লিশমেননিয়া ডনোভেনি যথাক্রমে ডায়রিয়া, প্রজনন তন্ত্রেও প্রদাহ ও কালাজ্বর রোগের জন্য দায়ী।

- **ডিপলো কক্‌কাই ঃ**

এই ধরনের কক্‌কাই জোড়ায় জোড়ায় থাকে।

- **ষ্টেফাইলো কক্‌কাই ঃ**

দুইয়ের অধিক সংখ্যায় একত্রে থোকা হয়ে থাকে। ষ্টেফাইলো কক্‌কাই কাটা ছেঁড়া জায়গায় সংক্রমণ করে এবং ফোঁড়ার কারণ হয়।

- **স্ট্রেপটো কক্‌কাই ঃ**

স্ট্রেপটো কক্‌কাই শিকল বা চেইন এর আকারে সাজানো থাকে। এই জীবাণু নাক ও গলায় সংক্রমণ করে থাকে। মেয়েদের প্রসবের সময় সংক্রমণের সুযোগ পেলে সুতিকাজ্বর বা পুয়ের পেরাল ফিভার ঘটায়।

খ) ব্যাসিলি ঃ

এই জীবাণুগুলো এককভাবে থাকে। ক্ষুদ্রাকার কাঠির মত দেখতে খাটো অথবা ফাঁপালো হতে পারে। দুই মাথা গোলাকার মসৃণ অথবা তীক্ষ্ম হতে পারে। ‘স্পোর’ হিসাবে নিজেদের লুকিয়ে রেখে বহুদিন পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে।

গ) স্পাইরুলিনা ঃ

এই জীবাণু দেখতে সরু স্প্রিং এবং স্ক্রু এর প্যাচের মতো দেহ ধারী।

বিভিন্ন ধরনের রোগ জীবাণুর আকৃতির চিত্র নীচে দেয়া হলো ঃ

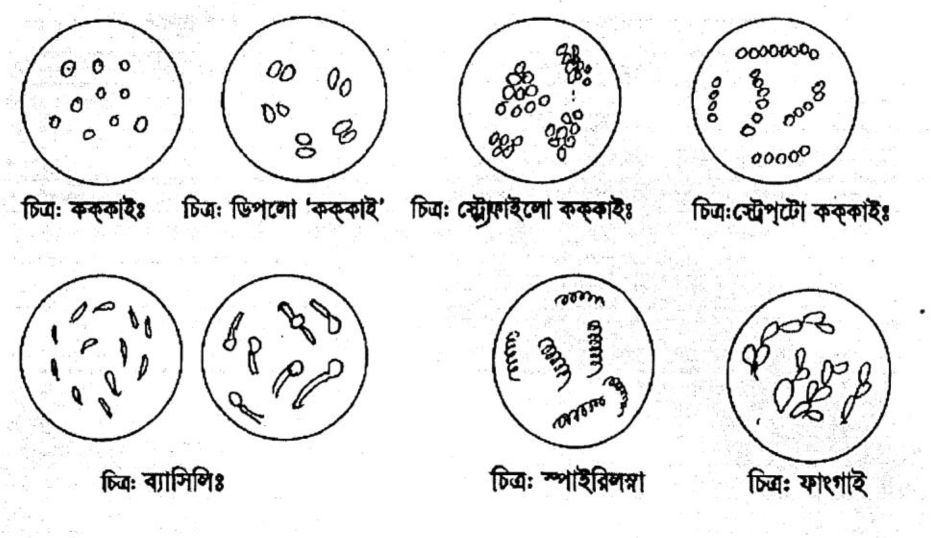

চিত্র ৫৮ ঃ বিভিন্ন রোগ জীবানুর আকৃতি

ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধির অনুকুল পরিবেশ হল ঃ গরম, স্যাৎসেঁতে স্থান বা ময়েস্চার, অন্ধকার, মৃতদেহ অথবা বস্তু (শাক-সবজী, মাছ-মাংস) ইত্যাদি। এদের মধ্যে অনেক জীবাণু আছে যারা কোন ক্ষতি করে না বরং উপকারী। যেমন ঃ

১) পচনশীল আবর্জনাকে রূপান্তরিত করে গাছপালার জন্য উপযুক্ত সারে পরিণত করে।

২) দুধকে জমাট বাধিয়ে দৈ প্রস্তুতে সাহায্য করে।

৩) ঈস্ট-গ্যাজানো সাহায্যে (স্পঞ্জি) নরম রূপ দেয়।

৪) গ্যাজানোর সাহায্যে মদ এবং সিরকার (সচ্ছতা আনা) চোলাইয়ে সাহায্য করে ইত্যাদি।

উপরোক্ত জীবাণুগুলো রোগ সৃষ্টি করে না। এজন্য এদেরকে নন-প্যাথোজেনিক (Non-Pathogenic) জীবাণু বলা হয়।

৪। রিকেটসিয়া (Rickettsia) ঃ

রিকেটসিয়া, ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস এর মাঝামাঝি একটি অণুজীব। এরা রক্তচোষা কীট পতঙ্গের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। এদের বৃদ্ধি কোষ কলার (Tissue) মধ্যে হয়ে থাকে। এই অণুজীব অনেক রকম জ্বরের জন্য দায়ী। ধনুষ্টংকার বা টিটেনাস রোগে জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করে টক্সিন দ্বারা স্নায়ুতন্ত্রে ক্ষতি করে। ডিপথেরিয়া রোগের জীবাণু ও টক্সিন দ্বারা শিশুদের আক্রান্ত করে।

৫। ভাইরাস (Virus) ঃ

ভাইরাস এক প্রকার ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র জীবাণু যা কেবল মাত্র জীব কোষের অভ্যন্তরে বংশ বৃদ্ধি করে। ভাইরাস নানা আকৃতির হতে পারে, যেমন- ত্রিকোণাকার, চৌকোণাকার, প্যাঁচানো ইত্যাদি। ভাইরাস

দেখার জন্য ইলেক্ট্রন-মাইক্রোস্কোপ (Electron Microscope) এর প্রয়োজন। এরা অতি সংক্রমণকারী এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস, সংস্পর্শ ও কীটপতঙ্গের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

বিভিন্ন অণুজীব দ্বারা সৃষ্ট রোগের উদাহরণ ঃ

অণুজীবের নাম	**সৃষ্ট কিছু রোগ**
প্রোটোজোয়া	আমাশয়, ভ্যাজাইনাইটিস, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি
ঈস্ট	দাঁদ, নবজাতক শিশুর মুখে সাদা ঘা (Oral Thrush) ইত্যাদি।
ব্যাকটেরিয়া	ফোঁড়া, পাঁচড়া, টনসিলাইটিস, নিউমোনিয়া, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, রক্ত আমাশয়, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, গনেরিয়া, সিফিলিস ইত্যাদি।
রিকেটসিয়া	বিভিন্ন ধরনের টাইফাস জ্বর।
ভাইরাস	সাধারণ সর্দি-কাশি/ ইনফ্লুয়েঞ্জা, গুটি বসন্ত, জল বসন্ত, হাম, পোলিও, ডেঙ্গু, জলাতংক, এইডস, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু ইত্যাদি।

পাঠ-২
অণুজীবের স্থানান্তর ও বিস্তার

অণুজীবের স্থানান্তর

কোন উৎস হতে অণুজীব অন্যস্থানে নিম্নলিখিত যে কোন পদ্ধতিতে স্থানান্তর হতে পারে ঃ

১। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে

বহু অণুজীব বিশেষ করে যারা ফুসফুস ও শ্বাস প্রণালীর প্রদাহ সৃষ্টি করে তারা নিঃশ্বাসে বায়ুর সাথে শরীরে প্রবেশ করে। রোগীরা যখন কাশে, হাঁচি দেয় অথবা কথা বলে তখন অসংখ্য জীবাণু বা অণুজীব বায়ুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তন্মধ্যে কিছু অণুজীব বায়ু ও ধুলিকণার সাথে মিশে থাকে, পরে শ্বাসের সাথে অন্য ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। একে ধুলি কণা ও বায়ুর মাধ্যমে সংক্রমণ বলে। যক্ষ্মা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ জীবাণু এভাবে বিস্তার লাভ করে।

২। খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে

অণুজীবসমূহ সংক্রমিত পানি ও খাদ্যের সাথে মুখগহ্বর ও খাদ্যনালীর মধ্য দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। সংক্রমিত হাতের নখের মাধ্যমেও এরা সংক্রমণ ঘটাতে পারে। কলেরা, টাইফয়েড, জন্ডিস প্রভৃতি রোগ এ ভাবেই ছড়ায়।

৩। সংস্পর্শের মাধ্যমে

বহুক্ষেত্রে অণুজীব সংস্পর্শের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। ত্বক অথবা ঝিল্লির ফাটলের মধ্য দিয়েই সাধারণতঃ তা ঘটে থাকে। সংস্পর্শ দুই প্রকারের হতে পারে। **(ক) প্রত্যক্ষ-** রোগীর শরীরের সাথে অন্য

ব্যক্তির শরীরের প্রত্যক্ষভাবে সংস্পর্শ ঘটার ফলে অন্য ব্যক্তি সংক্রমিত হয়। **(খ) পরোক্ষ-** সংস্পর্শ প্রত্যক্ষভাবে না ঘটে কোন জিনিষপত্র, যেমন- তোয়ালে, গামছা, বিছানাপত্র, ব্যবহৃত জামা-কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমেও সংক্রমণ ঘটে থাকে, যেমন- চর্মরোগ।

৪। যৌন সংগমের মাধ্যমে

কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন সংগমের মাধ্যমে অণুজীব/জীবাণুসমূহ অন্যের শরীরে প্রবেশ করে। যৌনরোগ যে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত হয় তারা এই পথেই শরীরে ঢোকে। সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস ইত্যাদি।

৫। কীট-পতঙ্গের দংশনের মাধ্যমে

অনেক অণুজীব/জীবাণু একজনের শরীর হতে অন্যজনের শরীরে কীটপতঙ্গ দ্বারা স্থানান্তরিত হয়। কোন কীট কোন রোগীকে দংশনের সময় রক্তের সাথে কিছু অণুজীব বা জীবাণু গ্রহণ করে। পরে অন্য কাউকে দংশনের সময় তার শরীরে উক্ত জীবাণুকে প্রবেশ করিয়ে দেয়। ম্যালেরিয়া, গোদরোগ, ডেঙ্গু জ্বর ইত্যাদির রোগ জীবাণু এভাবে ছড়ায়।

পাঠ-৩

সংক্রমণের ফলাফল, নিয়ন্ত্রক ও বহিঃপ্রকাশ

রোগ জীবাণু সংক্রমণের ফলাফল

রোগ জীবাণু দেহে প্রবেশের পর বংশবৃদ্ধি করে অনিষ্ট সাধন করে। এ ক্ষমতাকে সংক্রমণশীলতা বলা হয়। যদি আক্রমণকারী জীবাণু সমূহের ক্ষমতা তীব্র হয় এবং যদি আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের প্রতিরোধক ক্ষমতা দূর্বল থাকে তবে সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করে, এমনকি রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। পক্ষান্তরে, ব্যাকটেরিয়ার ক্ষমতা যদি মৃদু হয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তির দেহের প্রতিরোধক ক্ষমতা যদি তীব্র হয় তবে ফলাফল গুরুতর হয় না। সংক্রমণের ফলাফল নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করেঃ

১। জীবাণুর বিশেষ আক্রমণাত্বক ক্ষমতা (Virulance)

প্রতিকুল পরিবেশে বেচে থাকার ব্যবস্থা ও পোষকের কোষ ও কলা ধ্বংসকারক রাসায়নিক পদার্থ জীবাণুর জন্য আক্রমনের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। আক্রান্ত ব্যক্তির কোষ ও কলায় ক্ষতি সাধন করার জন্য টক্সিন (Toxin) ছাড়াও বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে। এ সকল পদার্থ টক্সিন (Toxin) এর বিষক্রিয়া দ্রুত ছড়াতে সাহায্য করে। ফলে এই জীবাণুগুলোর আক্রমণ তীব্র হয়।

২। জীবাণুর অভিবিষ প্রস্তুত করার ক্ষমতা (Power to develop of Toxin)

জীবাণুসমূহ তাদের জীবনকালে এমন বহু পদার্থ প্রস্তুত করে থাকে যাদের কলা ও কোষের উপর মারাত্মক অনিষ্টকর প্রভাব আছে। এ সমস্ত ক্ষতিকারক পদার্থকে অভিবিষ (Toxin) বলে। যে জীবাণু যত তীব্র অভিবিষ (Toxin) তৈরী করতে পারে, সে তত বেশী ক্ষতি করতে পারে।

**৩।	জীবাণুর আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ পথ**

ফলপ্রসু আক্রমণ করতে হলে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে সঠিক পথে প্রবেশ করতে এবং কলায় পৌঁছাতে হবে। জীবাণু যদি এমন পথে প্রবেশ করে যেখান হতে রক্তে পৌঁছাতে সহজ হয়, তবে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে ছড়ানো সহজ এবং দ্রুত হবে।

**৪।	আক্রমণকারী জীবাণুর সংখ্যা**

সংক্রমণের ফলাফল আক্রমণকারী জীবাণুর সংখ্যার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কোন কোন জীবাণু কম সংখ্যায় ক্ষতি করতে পারে। উদাহরণঃ ক্লোসট্রিডিয়াম টিটানি। পক্ষান্তরে, অনেক জীবাণু এমন আছে যারা তখনই ক্ষতিসাধন করতে পারে যখন তারা সংখ্যায় প্রচুর থাকে।

সংক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রতিরোধ্যতা (Resistance/Immunity) ঃ

পোষকের দেহে ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য মহাক্ষুদ্র জীবাণুর আক্রমণের হাত হতে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতাকে প্রতিরোধ্যতা (Immunity) বলে। প্রতিরোধ্যতা বা ইমিউনিটিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যায়ঃ

ক) প্রাকৃতিক (Natural)

খ) অর্জিত (Acquired)

ক) প্রাকৃতিক প্রতিরোধ্যতা (Natural Immunity)

প্রাকৃতিকভাবে প্রত্যেক মানুষ বা প্রাণী কোন না কোন প্রকার ও মাত্রার প্রতিরোধ্যতার অধিকারী। এ ক্ষমতা সে বংশানুক্রমে লাভ করে থাকে।

খ) অর্জিত প্রতিরোধ্যতা (Acquired Immunity)

যে প্রকারের প্রতিরোধ্যতা মানুষ বা প্রাণী স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিকভাবে পায় না এবং যা সে বিভিন্ন উপায়ে অর্জন করে থাকে তাকে অর্জিত প্রতিরোধ্যতা (Acquired Immunity) বলে।

সক্রিয় প্রাকৃতিক প্রতিরোধ্যতা (Active Natural Immunity)

এ ক্ষেত্রে যে এন্টিবডি (Antibody) উৎপন্ন হয় তা শরীরে প্রতিক্রিয়া হিসাবে তৈরী হয়ে থাকে। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত রোগের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এ প্রতিরোধ্যতা অর্জিত হয় বলে একে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ্যতা বলা হয়।

সক্রিয় কৃত্রিম প্রতিরোধ্যতা (Active Artificial Immunity)

দেহ ক্ষেত্র বিশেষে কৃত্রিম উপায়ে প্রতিরোধ্যতা প্রাপ্ত হয়। ব্যাকটেরিয়া জীবিত, মৃত অথবা অনুকৃত (Attenuated) অবস্থায় ভ্যাকসিনের মাধ্যমে শরীরে ঢোকানো হয় যা এন্টিবডি প্রস্তুতের জন্য কলা (Tissue) কে উত্তেজিত করে। উদাহরণ- কলেরা প্রতিষেধক ভ্যাকসিন, ডিপিটি ভ্যাকসিন, হামের ভ্যাকসিন ইত্যাদি।

নিশ্চেষ্ট প্রতিরোধ্যতা

এক্ষেত্রে দেহকে এন্টিবডি নিজেকে তৈরী করতে হয় না। পূর্ব হতে প্রস্তুত এন্টিবডি বাহির হতে দেহে আসে। এটি দুই প্রকারের হয়। যথা-

১। প্রাকৃতিক নিশ্চেষ্ট প্রতিরোধ্যতা ঃ

এক্ষেত্রে শিশুরা মায়ের নিকট হতে জরায়ুতে অবস্থান কালে গর্ভফুলের (Placenta) মাধ্যমে এন্টিবডি লাভ করে থাকে। এই এন্টিবডি দ্বারা শিশুরা প্রায় ছ'মাস পর্যন্ত বিভিন্ন রোগ হতে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম। উদাহরণ- ডিপথেরিয়া।

২। কৃত্রিম নিশ্চেষ্ট প্রতিরোধ্যতা ঃ

অন্য প্রাণীর দেহে জীবাণু ঢুকিয়ে তাদের কলার সাহায্যে এন্টিবডি তৈরী করা যায়। এই আক্রান্ত প্রাণীর রক্তের সিরাম যার মধ্যে এন্টিবডি বিদ্যমান তা মানবদেহে প্রবেশ করিয়ে প্রতিরোধ্যতা বাড়ানো যায়। এই প্রকারের প্রতিরোধ্য তাকে নিশ্চেষ্ট কৃত্রিম প্রতিরোধ্যতা বলা হয়। উদাহরণ- এন্টি টিটেনাস সিরাম।

সংক্রমণের বহিঃপ্রকাশ

শরীরে জীবাণু সংক্রমণের বহিঃপ্রকাশ বা প্রতিক্রিয়া (Manifestation of Infection) নিম্নলিখিতভাবে হয়ে থাকে ঃ

(ক) স্থানীয় প্রতিক্রিয়া

স্থানীয় প্রতিক্রিয়াসমূহ হল-

১। কোষে প্রদাহ (Cellulitis) ঃ বিশেষ বিশেষ কিছু জীবাণু ত্বকভেদ করে শরীরে প্রবেশ করে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যার ফলে আক্রান্ত স্থানের অনেকটুকু জায়গা ঘিরে লাল হয়ে ফুলে যায়। স্থানীয় লশিকা গ্রন্থিও ফুলে যেতে পারে। স্ট্রেপটো কক্কাই (Streptococci) এ ধরনের সংক্রমণ করে থাকে।

২। ফোঁড়া (Abscess) ঃ বহু ব্যাকটেরিয়া তীব্র প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে। ফলে স্থানটা লালচে, গরম ও ব্যথাযুক্ত হয় ও পরে পুঁজ সৃষ্টি হয়। স্ট্যাফাইলো কক্কাই (Staphylococci) এ ধরনের সংক্রমণের জন্য দায়ী।

৩। **গ্র্যানিউলোমা (Granuloma) ঃ** কিছু জীবাণু একই স্থানে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় অবস্থায় থেকে গ্র্যানিউলোমা উৎপন্ন করে। উদাহরণ- যক্ষ্মা রোগের জীবাণু (Mycobacterium Tuberculosis)।

(খ) সাধারণ প্রতিক্রিয়া ঃ

স্থানীয় প্রতিক্রিয়া ছাড়াও বহু ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে শরীরের সাধারণ প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। যেমন- শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি (Fever), কম্পন (Rigor), শীত শীত ভাব (Chiling), রক্তস্বল্পতা (Anaemia), মাথা ব্যাথা, পেট ব্যাথা ইত্যাদি।

(গ) দূরবর্তী স্থানে প্রতিক্রিয়া ঃ

উক্ত ব্যাকটেরিয়া শরীরের যে কোষ বা কলায় স্থাপিত হয় সে সমস্ত স্থানে স্থানীয় ভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা ছাড়াও তাদের অভিবিষ (Toxin) দ্বারা দূরবর্তী কোন কোন কলাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় করনি ব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরিয়া গলাকোষে আক্রান্ত করলেও হৃদপিন্ডের মাংসকে আঘাত হানতে পারে। আবার ক্লোসট্রেডিয়াম টিটানি স্থানীয় ক্ষতে অবস্থান গ্রহণ করলেও দূরবর্তী মাংসকে সঙ্কোচিত করতে সক্ষম।

পাঠ-৪
ব্যাকটেরিয়ার ধ্বংস সাধন

ব্যাকটেরিয়ার ধ্বংস সাধন (Destruction of Bacteria)

জীবাণু যেমন বিস্তার লাভ করে তেমনি আবার তারা প্রাকৃতিক নিয়মে ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়। সংখ্যা বৃদ্ধি ও ধ্বংস এ দুটো প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলতে থাকে। এ দুটো প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করে আমরা দৈনন্দিন জীবনে তা অনেক কাজে লাগাতে পারি। দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জীবাণুনাশ করার জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজন হতে পারে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এ জ্ঞান বিশেষ কাজে লাগে।
সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে ক্ষতিকারক জীবাণুর ধ্বংস করার প্রয়োজন আছে। কাজেই অণুজীব কিভাবে ধ্বংস হয় সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

পরিবেশ নিরাপদ রাখার জন্য এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিভিন্ন জিনিস জীবাণুমুক্ত করার প্রয়োজন হয়। ব্যাকটেরিয়া সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করাকে জীবাণুমুক্তকরণ (Sterilization) বলে।

যে সমস্ত শক্তি ব্যাকটেরিয়াকে সর্ম্পূণরুপে ধ্বংশ করে তাদের জীবণু ঘাতক (Bacteriocidal) বলে। যে সমস্ত উপায়ে ব্যাকটোরিয়াদের শুধুমাত্র বংশ বৃদ্ধিরোধ করা হয় তাদের জীবাণুরোধী (Bacteriostatic) বলে।

যে সমস্ত পদার্থ বা শক্তি জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়াদের ধ্বংস করে থাকে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-

ক) ভৌতিক (Physical)

খ) রাসায়নিক (Chemical) এবং

গ) জৈবিক (Biological)।

ক) ভৌতিক ঃ ভৌতিক উপায়সমূহ যা দ্বারা ব্যাকটেরিয়াকে বিনাশ বা ধ্বংস করা যায় সেগুলো হলো ঃ

১. উত্তাপ

ক) শুষ্ক উত্তাপ

খ) সিক্ত উত্তাপ

২. তেজস্ক্রিয়তা

ক) রাসায়নিক- বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যাদি দ্বারা জীবাণু ধ্বংস করা যায়।

খ) জৈবিক- বিভিন্ন ধরনের বিশেষভাবে তৈরী অতি সূক্ষ্ম ফিল্টার দ্বারা জীবাণু আলাদা করা যায়।

ভৌতিক পদ্ধতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

তাপ ঃ তাপ জীবাণুকে ধ্বংস করার সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার। তাপ দুই ভাবে প্রয়োগ করা যায়ঃ শুষ্ক উত্তাপ এবং সিক্ত উত্তাপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমেই জীবাণু ধ্বংস করা হয়।

শুষ্ক তাপ ঃ শুষ্ক তাপ জীবাণুর সাইটোপ্লাজমকে নষ্ট করে তাদের মৃত্যু ঘটায়। স্পোরসমৃদ্ধ জীবাণুকে ১৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এক ঘন্টা যাবৎ তাপ দিলে জীবাণু ধ্বংস হয়।

কি উপায়ে শুষ্ক তাপ প্রয়োগ করা যায়?

শুষ্ক তাপ নিম্ন উল্লেখিত উপায়ে প্রয়োগ করা যায়ঃ

- গরম বায়ুর চুল্লী ব্যবহার করে
- রেড হিট (Red heat) ঃ ধাতব বস্তুকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- জ্বালান (Flaming) ঃ ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিকে জীবাণুমুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- পুড়িয়ে ফেলা (Burning) ঃ জীবাণু সংক্রমিত দ্রব্যাদি, যেমন- রোগীর ব্যবহৃত কাপড় চোপড়।
- ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পুড়িয়ে পরিবেশকে নিরাপদ করা হয়।

সিক্ত উত্তাপ ঃ গরম বাষ্প ঃ সিক্ত উত্তাপের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়াসমূহের ধ্বংস করার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময় ও তাপমাত্রার প্রয়োজন। স্পোরসমৃদ্ধ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের জন্য আধা ঘন্টা সময় ও ১২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপের প্রয়োজন। স্পোরহীন ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজন কম, মাত্র ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপ ও ৩০ মিনিট সময় কাল।

সিক্ত উত্তাপ প্রয়োগের বিভিন্ন পন্থা ঃ

সিক্ত তাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ

১) তাপমাত্রা

২) তাপ প্রয়োগের সময় কাল

৩) চাপ প্রয়োগের মাত্রা

সিক্ত তাপ প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ তিনটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ আদর্শ ও সুচারুভাবে শোধনের জন্যে ১২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, ১৫ পাউন্ড/বর্গইঞ্চি চাপ ও ১৫ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হয়। এই পন্থায় যে সমস্ত দ্রব্য শোধন করা যায় তা হল ঃ (১) অস্ত্রোপচারের ও ক্ষত বাঁধার পট্টি (Dressing and Bandage), (২) কালচার মিডিয়া, (৩) পরিত্যক্ত মিডিয়া, (৪) অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, (৫) কাপড়-চোপড়।

অটোক্লেভ

বর্ধিত চাপ সহকারে বাষ্পায়িত করার পদ্ধতিই জীবাণুমুক্ত করার জন্য সর্ব প্রচলিত ও উৎকৃষ্ট পন্থা এবং যে যন্ত্রের সাহায্যে এই কাজ সমাধা হয় তার নাম অটোক্লেভ। অটোক্লেভ এবং উহার ব্যবহার সম্পর্কে বিষয়-৫ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রাসায়নিক পদ্ধতি

উপরে উল্লেখিত পদ্ধতি ছাড়া বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা বহু পদার্থকে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এরা বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। জীবাণুনাশক (Disinfectant) বলতে এমন সব রাসায়নিক দ্রব্যকে বুঝায় যারা রোগ উৎপাদক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সক্ষম। কিন্তু এরা স্পোরকে ধ্বংস করতে পারে না। এদের মৃত বা জীবনহীন দ্রব্যের উপর ব্যবহার করা হয়। এনটিসেপটিক (Antiseptic) বলতে এমন সব রাসায়নিক পদার্থকে বুঝায় যারা জীবাণুকে ধ্বংস অথবা তাদের বৃদ্ধিকে রোধ করতে পারে। এনটিসেপটিক হিসাবে ব্যবহার করতে হলে কম শক্তিসম্পন্ন হতে হবে যাতে কলার কোন ক্ষতি সাধিত না হয়। নীচের উল্লেখিত ছকে সাধারণতভাবে ব্যবহৃত জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি দেখানো হলোঃ

জীবাণুমুক্তকরণের ধাপসমূহ

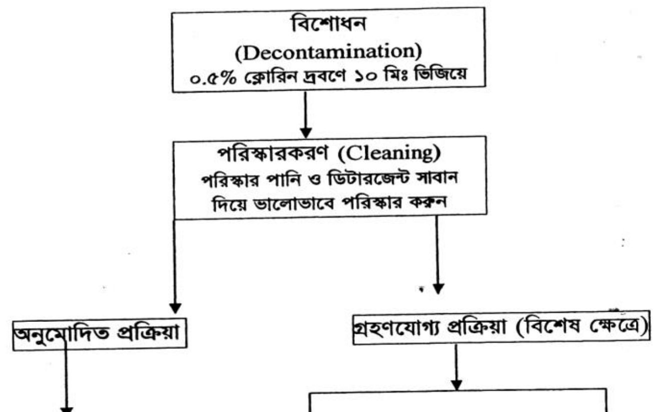

অধ্যায় ৪ ঃ প্যাথলজি

পাঠ-১
প্যাথলজি ও প্যাথলজিস্ট

প্যাথলজি (Pathology)

চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে বিভাগে রোগ, রোগের কারণ সৃষ্টি, প্রকাশ, আক্রান্ত অংশের বিকৃত অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে জানা যায় তাকে প্যাথলজি (Pathology) বলে।

প্যাথলজি-এর শ্রেণী বিভাগ

১. জেনারেল প্যাথলজি

২. ভাইরোলজি

৩. মাইক্রোবায়োলজি

৪. ব্যাকটেরিওলজি

৫. ক্লিনিক্যাল কেমিষ্ট্রি

৬. ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি

৭. হিস্টোপ্যাথলজি ও সাইটোপ্যাথলজি

৮. ইমিউনোলজি

৯. হেমাটোলজি

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট:

চিকিৎসকের উপদেশ অনুযায়ী রোগীর নমুনা সংগ্রহ ও বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যিনি সঠিক তথ্য প্রদান করেন, তিনিই "মেডিকেল টেকনোলজিস্ট"।

যে সকল নমুনা দ্বারা রোগের পরীক্ষা করা হয়-

১. রক্ত
২. মল
৩. মূত্র
৪. কফ
৫. থুথু
৬. চোঁখের ময়লা
৭. কনের ময়লা
৮. নাকের ময়লা
৯. বীর্য
১০. জরায়ুর মুখের রস
১১. সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড
১২. পুঁজ

প্যাথলজিস্ট:

যে ব্যক্তি মেডিকেল টেকনোলজিস্টের কাজ সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা পুনরায় পরীক্ষা করে প্রতিবেদন দেনে তিনি হলে প্যাথলজিস্ট। একজন অভিজ্ঞ প্যাথলজিস্টের কাজ হলো সঠিক রোগ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

পাঠ-২
রক্ত

রক্ত (Blood) একটি বিশেষ ধরনের তরল যোজক টিস্যু। রক্তের PH হলো ৭.৩৬-৭.৪৫।

রক্তের কাজ ঃ

১. Lungs থেকে অক্সিজেন বহন করে টিস্যুতে নিয়ে যায় এবং টিস্যু থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বহন করে Lungs -এ নিয়ে আসে
২. শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে।

৩. অম্ল ক্ষারক -এর সমতা রক্ষা করে

৪. পানি এবং Electrolytes সমতা রক্ষা করে

৫. হরমোন, ভিটামিন, লবন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ বহনের কাজ করে।

৬. রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রন করে।

৭. দেহ থেকে অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য lungs, kidney, skin & intestine এ নিয়ে যায় এবং এদের মাধ্যমে বের করে দেয় ।

৮. রক্তপাত প্রতিরোধ করে।

রক্ত (Blood)- এর বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

- সুস্থ শরীরে রক্ত থাকে - ৫-৬ লিটার
- রক্তের Normal Reaction: Slightly Alkaline
- তাপ মাত্রা ঃ- ৩৬-৩৮° c
- স্বাদ (Taste) ঃ কিছুটা লবণাক্ত (Salty)
- রক্তের রং ঃ রক্তে লোহিত কণিকা (RBC) এর মধ্যে হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin)-এর উপস্থিতির জন্য রক্তের রং লাল দেখায়।

হিমোগ্লোবিন (Hemoglobin) % -এর Normal Value

Male- 14 - 18 gm/dl

Female-11.5 - 16.5 gm/dl

Fullterm baby (cord blood) : 13.5 - 19.5 gm/dl

Children (1 yr) : 11- 13 gm/dl

Children (10-12 yrs.) :   11.5-14.5 gm/dl

হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ার কারন :

১. গর্ভাবস্থা

২. পাইল্স

৩. পাকস্থলীতে ক্যান্সার

৪. মাসিক চক্রের সময়

৫. দুর্ঘটনাজনিত কারণে

৬. বড় ধরনের সার্জারী

রক্তের গ্রুপ

যখন রোগীর শরীরে রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় তখনই রোগীর রক্তের গ্রুপ ও RH-ফ্যাক্টর পরীক্ষা করা হয়

রক্তের গ্রুপ ৪টি যথা:

১. A	2. AB
৩. B	৪. O

যে তথ্যটি সবার জানা প্রয়োজন তা হলো-

O গ্রুপ হলো সার্বজনীন দাতা (Universal Doner) অর্থাৎ এই গ্রুপের রক্ত সব গ্রুপের রক্ত গ্রহীতাকে দিতে পারবে কিন্তু সব গ্রুপের কাছ থেকে নিতে পারবে না। অপরদিকে AB গ্রুপ হলো সার্বজনীন গ্রহীতা (Universal Recipient) অর্থাৎ এই গ্রুপের রক্ত সব গ্রুপের রক্ত গ্রহীতাকে দেয়া যাবে না কিন্তু এই গ্রুপের রক্ত গ্রহীতা অন্য সব গ্রুপের কাছে থেকে রক্ত নিতে পারবে।

Rh-factor পরীক্ষার মাধ্যমে Positive ও Negative নির্ণয় করতে হবে।

রক্তের প্রকার ভেদঃ

১. শ্বেত রক্ত কনিকা (White Blood Cell)

২. লোহিত রক্ত কনিকা (Red Blood Cell)

৩. অনুচক্রিকা (Platelets)

শ্বেত রক্ত কনিকা (White Blood Cell)

শ্বেত রক্ত কনিকা (White Blood Cell) হলো রক্তের color less, nucleated cells.

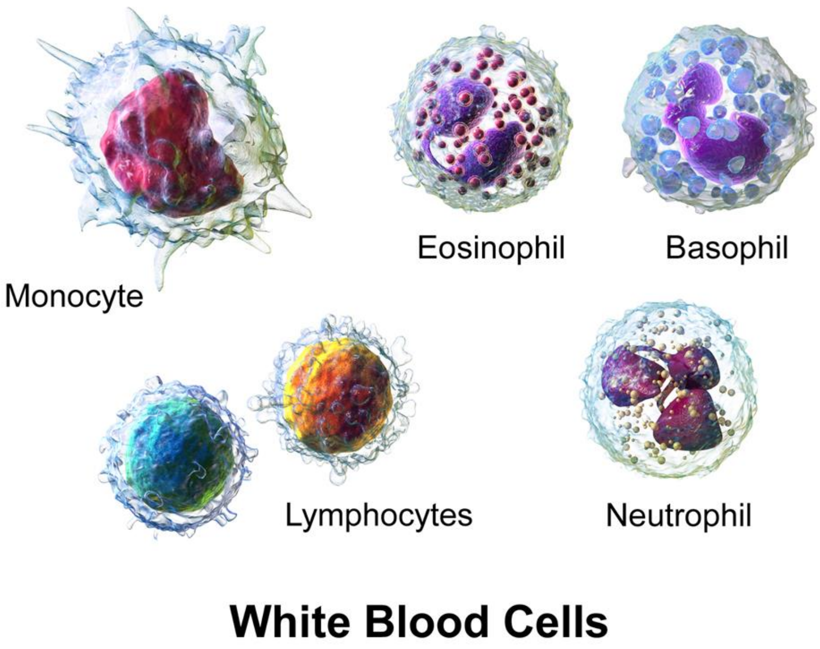

চিত্র ৫৯ ঃ শ্বেত রক্ত কনিকা

শ্বেত রক্ত কনিকা-এর স্বাভাবিক মাত্রা :

১. পূর্ণ বয়স্ক	4000 - 11000 cu m.m
২. শিশু	5000 - 15000 cu m.m
৩. দুগ্ধ শিশু	6000 - 20,000/cu m.m

যেসব রোগে শ্বেত রক্ত কনিকা (WBC) বেড়ে যায় (Leucocytosis) :

১. রক্তক্ষরণ

২. বাতজ্বর

৩. যে কোন সংক্রমণ

৪. গর্ভাবস্থা

৫. সদ্যজাত শিশু

৬. দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্যান্সার

৭. স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার

৮. একলামশিয়া

৯. কলেরা

১০. ডিপথেরিয়া

১১. ফাংগাল সংক্রমণ

যে সব শ্বেত রক্ত কনিকা (WBC) কমে যায় (Leucopenia):

১. টাইফয়েড

২. হেপাটাইটিস

৩. ম্যালেরিয়া

৪. কালাজ্বর

৫. ডেঙ্গুঁজ্বর

৬. রক্তস্বল্পতা

Differential count of WBC (Normal Range) :

১. নিউট্রোফিল	50 -70 %
২. ইউসিনোফিল	01- 04%
৩. বেসোফিল	00- 01%
৪. লিম্ফোসাইট	20 - 40%
৫. মনোসাইট	02 - 10%

যে সকল রোগে নিউট্রোফিল (Neutrophil) বেড়ে যায়:

১. রক্তক্ষরণ

২. বাতজ্বর

৩. যে কোন সংক্রমণ

৪. গর্ভাবস্থা

৫. সদ্যজাত শিশু

৬. দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ক্যান্সার

৭. স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার

৮. একলামশিয়া

৯. কলেরা

১০. ডিপথেরিয়া

১১. ফাংগাল সংক্রমণ

যে সকল রোগে নিউট্রোফিল (Neutrophil) কমে যায়ঃ

১. এ্যাপলাসটিক এনিমিয়া

২. টাইফয়েড

৩. হেপাটাইটিস

৪. ম্যালেরিয়া

৫. ক্যান্সার এর ঔষধ প্রয়োগ

যে সকল রোগে ইউসিনোফিল (Eosinophill) বেড়ে যায়ঃ

১. এ্যাজমা

২. ম্যালেরিয়া

৩. ফাইলেরিয়া

৪. কৃমি

৫. চর্মরোগ

৬. রিউমাটোয়েড আথ্রাইটিস

৭. একজিমা

যে সকল রোগে ইউসিনোফিল (Eosinophill) কমে যায়ঃ

১. হঠাৎ উত্তেজিত হলে

২. কুসিং সিনড্রোম

৩. এ্যাপলাসটিক এনিমিয়া

যে সকল রোগে লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) বেড়ে যায়ঃ

১. টাইফয়েড

২. যক্ষ্মা

৩.মাম্পস

৪. হেপাটাইটিস

৫. কালাজ্বর

যে সকল রোগে লিম্ফোসাইট (Lymphocyte) কমে যায়ঃ

১. ক্যান্সার এর ঔষধ প্রয়োগ

২. এইডস্

৩. সালফার জাতীয় ঔষধ ব্যবহার

৪. রেডিওথেরাপী

যে সকল রোগে বেসোফিল (Basophill) বেড়ে যায়ঃ

১. যক্ষ্মা

২. মাসিক এর সময়

৩. হুপিং কাশি

৪. হেপাটইটিস

৫. সিফিলিস

যে সকল রোগে মনোসাইট (Monocyte) বেড়ে যায়ঃ

১. ম্যালেরিয়া

২. কালাজ্বর

৩. সিফিলিস

৪. রিকেটসিয়া

৫. রিউমাটোয়েড আথ্রাইটিস

লোহিত রক্ত কনিকা (Red Blood Cell)

লোহিত রক্ত কণিকা (RBC) হলো circular, bi-concave, non-nucleated disc like cell.

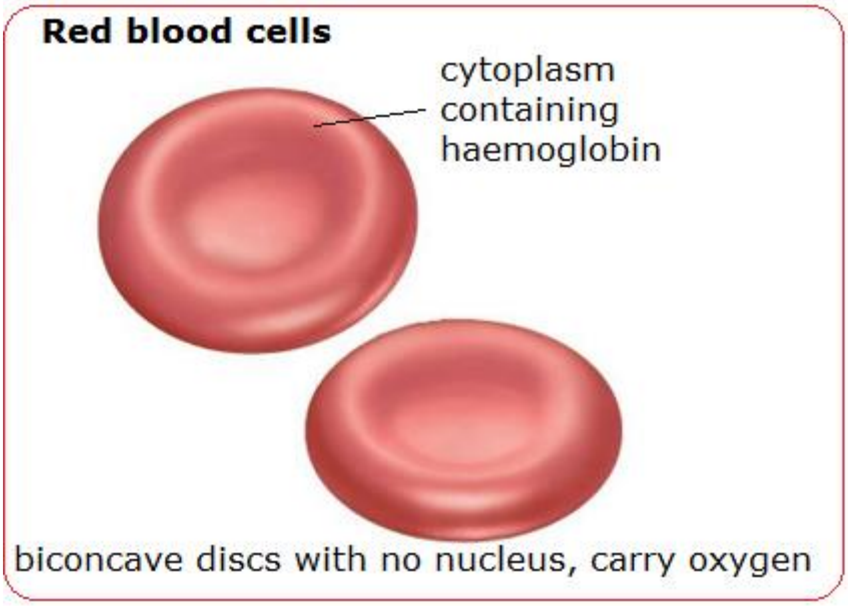

চিত্র ৬০ ঃ লোহিত রক্ত কনিকা

লোহিত রক্ত কনিকা (RBC) এর স্বাভাবিক মাত্রা :

পুরুষ	4.5-6.5 million/cu.m.m
মহিলা	3.8-5.8 million/ cu.m.m
শিশু (১ বছর)	3.6-5.2 million/ cu.m.m
শিশু (১০-১২ বছর)	4.5-5.0 million/ cu.m.m

(১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ)

লোহিত রক্ত কনিকা (RBC) কমে গেলে যে সকল রোগ হয় :

১.এনিমিয়া

২.লিউকেমিয়া

৩.দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত

৪. কালাজ্বর

৫. টাইফয়েড

Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)

লোহিত কনিকার তলানী পড়াকে Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) বলে।

ESR এর স্বাভাবিক মাত্রা (Westergren Method) :

১. পুরুষ 0 - 10 mm of 1st hr.

২. মহিলা 0 - 20 mm of 1st hr.

যে সকল কারণে ESR বেড়ে যায়ঃ

১. গর্ভাবস্থায়
২.বৃদ্ধ বয়সে
৩. বিভিন্ন রোগের টিকা দিলে
৪. যক্ষা হলে
৫. হৃদরোগে (মায়ো কার্ডিয়াল ইনফার্কশন)

৬. বাত জর হলে

৭. তীব্র রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে

৮. ক্যান্সার রোগ হলে

৯. কিডনী রোগ হলে

১০. রিউমাটোয়েড আথ্রাইটিস হলে

১১.কুষ্ঠ রোগ হলে

১২. কালা জ্বর হলে

যে সকল কারণে ESR কমে যাওয়ার কারণ::

১. লিভারের কার্যকারিতা বন্ধ হলে

২. হৃদপিন্ডের কাজ বন্ধ হলে

৩. সিক্‌ল সেল এনিমিয়া হলে

অনুচক্রিকা (Platelets)

অনুচক্রিকা (Platelets) হলো small colourless ও non-nucleated structure (নিউক্লিয়াসবিহীন)

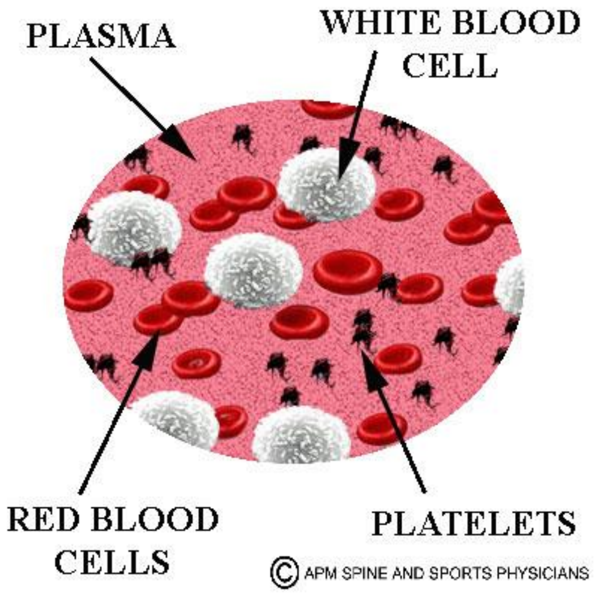

চিত্র ৬১ ঃ অনুচক্রিকা

অনুচক্রিকা (Platelets)-এর স্বাভাবিক মাত্রাঃ

1.5 – 4 lac/cu.m.m of bloodযে সকল কারণে অনুচক্রিকা (Platelets) বা Thrombocyte এর পরিমান বেড়ে যায়ঃ

১. আয়রনের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা

২.অনেকদিনের সংক্রমণ

৩. সার্জারী

৪. হঠাৎ রক্তক্ষরন

যে সকল কারনে Thrombocyte এর পরিমাণ কমে যায়ঃ

১. লিভারের রোগ হলে

২. ডেঙ্গুঁজ্বরে হলে

৩. জন্মগত লিউকেমিয়া থাকলে

৪. রক্ত সঞ্চালন করলে

৫.ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায়

৬. এ্যাপলাস্টিক এনিমিয়া হলে

পাঠ-৩
রোগ নির্ণয়ে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা

- **Liver Function Test (LFT) :**

Liver function জানতে পর্যায়ক্রমে সে সকল পরীক্ষা করা হয়:

১. Serum Bilirubin

২. SGPT

৩. SGOT

৪. Serum Alkaline Phosphatase

৫. Serum Total Protein

৬. Albumin Globulin Ratio

৭. Prothrombin Time

৮. Alpha Fetoprotein (AFP)

৯. USG of HBS (Hepato Billiary System)

১০. CT scan of Liver

- **কিডনী পরীক্ষার পরীক্ষাসমূহ:**

১. Serum Creatinine

২. Serum Urea

৩. Total Protein, Albumin

৪. Creatinine Clearance

৫. 24 hrs. Total Urinary Protein.

৬. Serum Electrolytes

৭. Urine Protein Creatinine Ratio

৮. X-ray of KUB region

৯. IVU (Intravenous Urography)

১০. Ultrasonogram of KUB

১১. Renogram

১২. Urine for R/M/E

- **Hepatitis -B** ভাইরাস রোগের তীব্রতা জানতে যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ

১. Liver Function Test (LFT) ২. HBeAg

৩. HBcAg ৪. HBsAg

৫. HBV DNA ৬. Prothrombin Time

৭. USG of HBS

- **Tuberculosisc (TB)** রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ

১. TC, DC, ESR

২. MT Test (Tuberculin Test)

৩. Anti TB IgG

৪. FNAC

৫. Sputum & Pus for C/S

৬. Sputum for AFB

৭. X-ray Chest (P/A & Lateral view)

৮. Biochemical Test for Pleural Effusion

- ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ

১. Blood for MP (thick & thin film)

২. Blood for MP (ICT)

৩. Blood for TC, DC, ESR, Hb%

৪. Urine for R/M/E

- **Typhoid** ও **Paratyphoid** রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ

১. Blood for TC, DC, ESR, Hb%

২. Widal Test

৩. Blood for C/S

৪. Urine for C/S

- **PUO (Pyerexia of Unknown Origin)** কি ধরনের জ্বর তা নির্ণয়ের জন্য যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ

১. Blood for TC, DC, ESR, Hb%, Platelet Count.

২. Peripheral Blood Film Study

৩. Febrile Antigen

৪.Test for Malarial Parasite (MP)

৫. Urine for R/M/E & C/S

৬. Dengue IgG/IgM

৭. Tuberculin Test (MT Test)

৮. X-ray Chest P/A view

- ডেঙ্গু রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ

১. Blood for TC, DC, ESR, Hb%, Platelet Count.

২. Anti-dengue IgG, IgM

৩. ICT for dengue

- **ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ**

১. Blood Glucose Level (Fasting &Random)

২. GTT

৩. HbAle

৪. Urine for R/M/E

প্রস্রাবে গ্লুকোজ পরীক্ষা পদ্ধতিঃ

পদ্ধতি : বেনেডিক্ট পরীক্ষা

যন্ত্রপাতিঃ টেস্ট-টিউব, স্পিরিট ল্যাম্প, ড্রপার, বেনেডিক্ট সলিউশন, টেস্ট-টিউব হোল্ডার

নমুনা : প্রস্রাব

পরীক্ষা পদ্ধতি :

১. প্রথমে ৫ মি.লি. বেনেডিক্ট সলিউশন টেস্ট টিউবে নিতে হবে।

২. টেস্ট-টিউবের নিচের দিকে তাপ দিতে হবে এবং তারপর ঠান্ডা করতে হবে।

৩. আট ফোটা urine যোগ করে ২ মিনিট ধরে তাপ দিতে হবে

৪. এর পর ঠান্ডা করতে হবে

৫. এখন রং পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ফলাফল

১. নীল (Blue)	Nill
২. সবুজ (Green)	(+)
৩. হলুদ (Yellow)	(++)
4. কমলা (Orange)	(+++)
5. ইটের মত লাল (Brick-red)	(++++)

Urine এর রং-এর উপর ভিত্তি করে ডায়াবেটিস-এর তীব্রতা নির্ণয় করা হয়।

- **হার্টের রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়:**

১. ECG

২. Lipid Profile

৩. CK-MB

৪. Troponin-I

৫. RBS with Cus

হার্টের বিশেষ পরীক্ষা সমূহ ঃ

১. ECG.

২. Echocardiogram

৩. CAG (Cardiac angiogram)

৪. ETT

Tyroid function জানতে যে সকল পরীক্ষা করা হয়:

১.Total T3 T4

২. TSH

৩. Thyroid Scanning

৪. Free T3T4

৫. Radioactive Iodine Uptake

- **রক্ত রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়:**

১. Blood for TC, DC, ESR, Hb%, Platelet Count.

২. Peripheral Blood Film (PBF)

৩. Total RBC Count

৪. PCV, MCV, MCH, MCHC

৫. Haemoglobin Electrophoresis

৬. Bone marrow Study

- **Allergy** রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ

১. Blood for TC, DC, ESR

২. Total Circulating Count

৩. IgE

- **Gastric Ulcer** রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ

১. S. Pylori

২. CBC

৩. Ba-meal X-ray of Stomach

৪. Plain X-ray of Abdomen

৫. Endoscopy

- **Appendicitis** রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ

১. Blood for TC, DC, ESR, Hb%

২. USG of L/A with RIF (Appendicular region)

৩. Urine for R/M/E

৪. Ba-meal X-ray of Appendix.

- **ব্রেন-এর রোগ নির্ণয়ে যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ-**

১. CT Scan of Brain

২. Electrolyte

- **গর্ভবতী মায়েদের যে সকল পরীক্ষা করা হয়ঃ**

১.Blood for Hb%

২. Blood Grouping & Rh Typing

৩. HbsAg

৪. RBS & COS

৫. Urine for R/M/E

৬. VDRL

৭. USG of –

a. Lower Abdomen (Early Pregnancy)

b. Pregnancy Profile (After 6 months)

- **মুত্র (Urine) কেন পরীক্ষা করা হয় :**

১. মূত্র তন্ত্রের সংক্রমণ জানতে

২. ডায়াবেটিস ও জন্ডিসের উপস্থিতি জানতে

৩. গর্ভধারন হয়েছে কিনা জানতে

৪. মূত্রতন্ত্রে পাথর আছে কিনা জানতে

৫. এ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসার ধারণা নিতে

৬. এন্টেরিক জ্বর (Enteric Fever) নির্ণয়ে

৭. প্রোস্টেট গ্লান্ডের সংক্রমণ নির্ণয়ে

- **মল (Stool) কেন পরীক্ষা করা হয় :**

১. ডায়রিয়া ও আমাশয় নির্ণয় করতে

২. জন্ডিসের টাইপ নির্ণয় করতে

৩. বিভিন্ন প্যারাসাইট এর প্রকার জানতে

৪. পরিপাক তন্ত্রের রক্তক্ষরণ হচ্ছে কিনা জানতে

৫. অগ্ন্যাশয় ও জন্ডিসের রোগের অবস্থা জানতে

- **Semen Analysis কেন করা হয় ?**

সাধারণত কোন দম্পতির সন্তান না হলে, পুরুষের Semen Analysis করে দেখা হয়। Semen এ শুক্রাণু (Sperm) আছে কিনা এবং এই শুক্রাণুর চলাচল (motility) স্বাভাবিক কিনা তা Semen Analysis এর মাধ্যমে দেখা হয়।

- **রক্তের Lipid Profile কি?**

রক্তের নিম্ন লিখিত পরীক্ষা সমূহ্কে এক সাথে Lipid Profile বলে।

১. Serum Cholesterol

২. HDL Cholesterol

৩. LDL Cholesterol

৪. Triglyceride

- **Electrolytes কি ?**

নিম্ন লিখিত গুলোকে একত্রে রক্তের Electrolytes বলে।

Sodium (Na^+)

Potassium (K^+)

Chloride (cl-)

Calcium (Ca^{++})

Bi-carbonate (HCO_3^-)

- **জীবানুমুক্তকরণ রাসায়নিক দ্রব্যের নাম :**

১. স্যাভলন

২. ডেটল

৩. অ্যালকোহল

৪. ফরমালিন

পাঠ-৪
ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগসমূহ

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগের নাম ও জীবাণুর নামসমূহ ঃ

রোগের নাম **(Disease)**	জীবাণুর নাম **(Organism)**
Typhoid	Salmonella Typhi
Paratyphoid	Salmonella Paratyphi
Cholera	Vibrio Cholerae
Tetanus	Clostridium Tetani
Tuberculosis	Mycobacterium Tuberculosis
Gonorrhoeae	Neisseria Gonorrhoeae
Diphtheria	Corynebacterium Diptheriae
Leprosy	Mycobacterium Leprae
Gastric Ulcer	Helicobacter Pylori
Anthrax	Bacillus Anthracis
UTI	E. Coli
Dysentery	Shigella Shegae

ভাইরাস জনিত রোগের নাম ও জীবাণুর নামসমূহ ঃ

রোগের নাম (Disease)	জীবাণুর নাম (Organism)
AIDS	HIV
Diarrhoea	Rota Virus
Mumps	Mumps Virus
Influenza	Influenza Virus
Measles	Measles Virus
Rubella	Rubella Virus
Chicken pox	Varicella-Zoster Virus
Common Cold	Rhino Virus
Pneumonia	Adeno Virus
Dengue Fever	Dengue Virus
Hepatitis-B	Hepatitis-B Virus
Poliomyelitis	Polio Virus
Rabies	Rabies Virus

অধ্যায় ৫ ঃ বায়োকেমিস্ট্রি

বায়োকেমিস্ট্রি (Biochemistry)
(প্রাণ রসায়ন / জীব রসায়ন)

পাঠ - ১

ভূমিকা এবং সংজ্ঞা

জীবনের রসায়ন নিয়ে যে বিজ্ঞানে আলোচনা করা হয় তাই হল **প্রাণরসায়ন** বা **জীব** রসায়ন (Biochemistry) । এটি জীববিজ্ঞান ও রসায়নের মধ্যে সেতুবন্ধনস্বরূপ। প্রাণরসায়ন আলোচনা করে কোষের বিভিন্ন উপাদান, যেমন আমিষ, শর্করা, চর্বি জাতীয় পদার্থ লিপিড, নিউক্লিয়িক এসিড এবং অন্যান্য জৈব অণু সম্পর্কে। প্রাণরসায়ন বিজ্ঞানের আওতাভূক্ত অন্যান্য বিষয়াবলীর মধ্যে জেনেটিক কোড (ডিএনএ, আরএনএ), আমিষ সংশ্লেষণ, বিভিন্ন কোষের মধ্যে সংকেত আদান প্রদান প্রভৃতি অন্যতম।

জীব রসায়নের ব্যবহার/ Application:

· পরীক্ষা: আমরা লিভার ফাংশন পরীক্ষা, কিডনি ফাংশন পরীক্ষা, থাইরয়েড ফাংশন পরীক্ষা এবং আরও অনেক কিছু করতে পারি। আমরা ডায়াবেটিস, কিডনি রোগ, হৃদরোগ ইত্যাদি নির্ণয় করতে পারি। অনেক ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাল রোগ, জেনেটিক রোগও নির্ণয় করতে পারি।

• গর্ভাবস্থা পরীক্ষা - 1. প্রস্রাব নমুনা এবং 2. একটি রক্ত নমুনা ব্যবহার করে। উভয় হরমোন মানুষের chorionic gonadotropin (এইচসিজি) উপস্থিতি সনাক্ত।

• স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং - স্তন ক্যান্সার -1 জিন (বি আরসিএ 1) এবং স্তন ক্যান্সার -2 জিন (বিআরসিএ ২) দুটি মিউটেশনের জন্য পরীক্ষার দ্বারা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি সনাক্তকরণ।

• প্রিনেটাল জেনেটিক টেস্টিং - সম্ভাব্য জেনেটিক ত্রুটিগুলির জন্য ভ্রূণের পরীক্ষা করা, ডাউন সিন্ড্রোমের মতো ক্রোমোসোমাল অস্বাভাবিকতা বা স্পিনা বিফিডার মতো জন্মের ত্রুটি সনাক্ত করা।

• পি কে ইউ টেস্ট - ফিনাইল কিটোনুরিয়া (পিকেইউ) একটি বিপাকীয় ব্যাধি যা ব্যক্তির মধ্যে ফিনাইলালানাইন হাইড্রক্সিলাস নামে একটি এনজাইম অনুপস্থিত। এই এনজাইমের অনুপস্থিতি ফিনিলালানাইনের বিল্ডআপকে মঞ্জুরি দেয়, যা মানসিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং - একটি জীব থেকে একটি জিন গ্রহণ এবং এটি অন্য মধ্যে স্থাপন। বায়োকেমিস্টরা ব্যাকটেরিয়াতে মানুষের ইনসুলিনের জন্য জিন ঢোকান। তারপর ব্যাকটেরিয়া মানুষের ইনসুলিন তৈরি করে।

• ক্লোনিং - ক্লোনিংটি স্বাভাবিকভাবেই বা কৃত্রিমভাবে প্রাণীটির জেনেটিক্যালি অভিন্ন কপিরাইট তৈরির প্রক্রিয়া। Dolly ভেড়া ছিল প্রথম স্তন্যপায়ী কখনও প্রাপ্তবয়স্ক পশু কোষ থেকে ক্লোন।

• জিন থেরাপি - একটি রোগ-সৃষ্টিকারী জিন প্রতিস্থাপন করার জন্য একটি সংশোধিত বা সুস্থ জিন প্রাণীর মধ্যে ঢোকানো হয়। সাধারণভাবে ডিএনএ বহন করতে পরিবর্তিত একটি ভাইরাসটি রোগীর লক্ষ্যযুক্ত কোষগুলিতে সুস্থ জিন সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়। এই প্রক্রিয়াটি প্রথমে 1990 সালে সফলভাবে ব্যবহৃত হয়।

বায়োকেমিস্ট্রির কিছু সংজ্ঞা:

পি.এইচ (pH): পি.এইচ হচ্ছে দ্রবীভূত হাইড্রোজেন আয়নের সক্রিয়তার পরিমাপ। পি.এইচ দ্বারা মূলত হাইড্রজেন আয়নের ঘনত্ব বোঝায়। ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানির পি.এইচ ৭ যাকে পি.এইচ স্কেলের নিরপেক্ষ মান হিসেবে ধরা হয়।

অম্ল (Acid): যে পদার্থ দ্রবণে প্রোটন দান করে তাকে এসিড বলে। উদাহরণ: সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ইত্যাদি।

ক্ষার (Alkaline): যে পদার্থ দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়ন দান করে তাকে এলক্যালি বলে। উদাহরণ: সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

বাফার: বাফার দুর্বল এসিড ও তার ক্ষারকের মিশ্রণ যা দ্রবনের পিএইচ এর পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উদাহরণ: ফসফেট বাফার, রক্ত প্রোটিন বাফার ইত্যাদি।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate): হল এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যার প্রতিটি অণুতে কার্বনের(C) সাথে হাইড্রোজেন(H) এবং অক্সিজেন(O) থাকে, যেখানে হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে অক্সিজেন পরমাণুর অনুপাত হয় ২:১(জলের অণুর মতই) উদাহরণ: ভাত, আলু, চিনি ইত্যাদি।

প্রোটিন/ আমিষ (Protein): নাইট্রোজেন জৈব যৌগের একটি শ্রেণী যা অ্যামিনো অ্যাসিডের এক বা একাধিক লম্বা চেইন দিয়ে গঠিত এবং এটি সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর একটি অপরিহার্য অংশ। উদাহরণ: পেশী, চুল, কোলাজেন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।

লিপিড (Lipid): জৈব যৌগগুলির মধ্যে যে কোনও শ্রেণীর ফ্যাটি এসিড বা তার ডেরিভেটিভস এবং জলে অদ্রবণীয় হয় কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় হয় তাকে লিপিড বলে। উদাহরণ: প্রাকৃতিক তেল, মোম এবং চর্বি।

বিপাক (Metabolism): জীবন বজায় রাখার জন্য একটি জীবন্ত জীবের মধ্যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে তাকে বিপাক বলে।

পাঠ – ২

ক্লিনিকাল বায়োকেমিস্ট্রি:

ক) লিভারের ফাংশন পরীক্ষা (Liver function tests) নিম্নলিখিত অবস্থার মধ্যে দেওয়া হয়:

- লিভার সংক্রমণের জন্য, যেমন হেপাটাইটিস সি
- লিভারের জন্য পরিচিত নির্দিষ্ট কিছু ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিরীক্ষণের জন্য
- রোগের নিরীক্ষণের জন্য যদি লিভারের রোগ ইতিমধ্যেই থাকে
- যকৃতের উপর স্কারিং (সিরোসিস) ডিগ্রী পরিমাপ করার জন্য
- যদি লিভার ডিসঅর্ডারের উপসর্গগুলি অনুভব করে তবে
- যদি গর্ভবতী হওয়ার পরিকল্পনা করে তবে

লিভারের ফাংশন পরীক্ষাগুলো হল:

অ্যালানাইন ট্রান্সএমাইনেজ/ অ্যালানিন আমিনো ট্রান্সফারেজ (ALT) পরীক্ষা

যদি লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা সঠিকভাবে কাজ না করে, তবে ALT রক্তে মুক্তি পায়।এই ALT র একটি উচ্চ ফলাফল লিভার ক্ষতির একটি চিহ্ন হতে পারে। ALT এর স্বাভাবিক পরিসীমা প্রতি লিটার (ইউ / এল) 7-55 ইউনিট।

অ্যাসপার্টেট ট্রান্সএমাইনেজ **/ অ্যাসপার্টেট আমিনো ট্রান্সফারেজ (এএসটি/AST) পরীক্ষা**

অ্যাসপার্টেট আমিনো ট্রান্সফারেজ (এএসটি) একটি শরীরের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যায়।এমন এনজাইম যা হার্ট, লিভার এবং পেশীসহ পাওয়া যায়।যেহেতু AST মাত্রা লিভার ক্ষতির জন্য নির্দিষ্ট নয়, এটি সাধারণত ALT- এর সাথে এক সঙ্গে লিভারের সমস্যাগুলি পরীক্ষা করার জন্য মাপা হয়।

অ্যালকালিন ফসফেটেজ (এলপি/ALP) পরীক্ষা

অ্যালকালিন ফসফেট**জ** (এলপি) হল হাড়, পৈত্তিকনল এবং লিভারের একটি এনজাইম।একটি ALP পরীক্ষা সাধারণত বিভিন্ন অন্যান্য পরীক্ষা সঙ্গে সমন্বয় করা হয়।এলপি উচ্চস্তরের লিভার ক্ষতি, পৈত্তিকনল এ বাধা, বা একটি হাড়রোগ ইঙ্গিত হতে পারে।

অ্যালবুমিন (Albumin) পরীক্ষা

অ্যালবুমিন যকৃত দ্বারা তৈরি প্রধান প্রোটিন। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক ফাংশন সঞ্চালিত।উদাহরণ স্বরূপ, অ্যালবুইন:

রক্তের বাহক থেকে লিক থেকে তরল বাধা দেয়

টিস্যু পুষ্টি করে

- আপনার শরীর জুড়ে হরমোন, ভিটামিন, এবং অন্যান্য পদার্থগুলি স্থানান্তর

- একটি অ্যালবুমিন টেস্ট আপনার যকৃত কতটা ভাল করে তা পরীক্ষা করে এই বিশেষ প্রোটিন এই পরীক্ষার একটি কম ফলাফল ইঙ্গিত করে যে লিভার সঠিকভাবে কাজ করছেনা। অ্যালবুমিনের সাধারণ পরিসীমা 3. 5-5 গ্রাম / ডিএল।

বিলিরুবিন (Bilrubin) পরীক্ষা

বিলিরুবিন লাল রক্ত কণিকার ভাঙ্গন থেকে বর্জ্য পণ্য।

একটি ক্ষতিগ্রস্ত লিভার সঠিকভাবে বিলিরুবিন প্রক্রিয়া করতে পারেনা। এটি রক্তে বিলিরুবিনের একটি অস্বাভাবিক উচ্চস্তরের সৃষ্টি করে। বিলিরুবিন পরীক্ষার একটি উচ্চ ফলাফল নির্দেশ করে যে লিভার সঠিকভাবে কাজ করছেনা। এই অবস্থাকে জন্ডিস বলা হয়। বিলিরুবিনের স্বাভাবিক পরিসীমা 0. 1-1 মিলিগ্রাম / ডিএল।

গামা গ্লুটামাইল ট্রান্স পেপটাইডেস (GGT)

জি জি টি হেপাটোসাইটস, বিলিয়েরি এপিথেলিয়াল কোষ, রেনাল টিউব, প্যানক্রিইয়া এবং অন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। সাধারণ সিরাম জিজিটি স্তর 9 থেকে ৪5 আইইউ / এল। Cholestasis উপস্থিত থাকলে GGT পরিমাপ সাধারণত উচ্চ হয়। উচ্চতর GGT এর অন্যান্য কারণ হল: ডায়াবেটিস, তীব্র প্যানক্রিটাইটিস, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, হাইপারথাইরয়েডিজম, স্থূলতা ইত্যাদি।

আলফা-ফিটো প্রোটিন (এএফপি): ক্যান্সার সৃষ্টিকারী এজেন্ট লিভারের কোষে সংক্রমণ রক্তে এএফপি বৃদ্ধি করে। সাধারণ সিরাম এএফপি স্তর ০–১৫ মাইক্রোগ্রাম/ লিটার। হেপাটোকেলুলার কার্সিনোমায় এএফপি ৪০০–৫০০ মাইক্রোগ্রাম/ লিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

খ) কিডনি ফাংশন পরীক্ষা (Kidney Function tests)

১. সিরাম ক্রিয়েটিনিন (Serum creatinine): ক্রিয়েটিনিন রক্ত পরীক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিডনি ফাংশন পরীক্ষা। রক্তের সাধারণ ক্রিয়েটিনিন লেভেল ০.৬ টু ১.২ মিলিগ্রাম/ডেসিলিটার। উচ্চ ক্রিয়েটিনিন লেভেল দুর্বল কিডনি ফাংশন বা কিডনি রোগ নির্দেশ করে।

২. ব্লাড ইউরিয়া (Blood urea): রক্তের ইউরিয়া স্বাভাবিক পরিসীমা ২০ থেকে ৪০ মিগ্রা / ডিএল। ক্রনিক কিডনি রোগ (সি কে ডি) এবং একিউট কিডনি ইনজুরি (AKI) কারণে উচ্চ রক্তের ইউরিয়া স্তর পাওয়া যেতে পারে।

৩. ব্লাড টোটাল প্রোটিন, এলবুমিন: নেফ্রোটিক সিনড্রোম রোগ এ রক্তের এলবুমিন এর মাত্রা কমে যায়।

৪. ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স: প্রতি মিনিটে কিডনি যে পরিমান রক্তকে ক্রিয়েটিনিন মুক্ত করতে পারে তাকে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স বলা হয়। কিডনির কার্যকারিতা বোঝার জন্য এটি একটি ভালো পরীক্ষা একজন সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স মহিলাদের জন্য প্রতি মিনিট প্রায় ৯৫ মিলিলিটার এবং পুরুষদের জন্য প্রতি মিনিট ১২০ মিলিলিটার।

৫. ২৪ আওয়ার্স টোটাল ইউরিনারি প্রোটিন: ২৪ ঘন্টার ইউরিন থেকে প্রোটিন এর মাত্রা বের করা হয়। এর মাধ্যমে কিডনির কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৬. সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট (Serum electrolyte): রক্তের কমন ইলেক্ট্রোলাইটস হলো, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদি। কিডনি ডিজিজ রক্তের ইলেক্ট্রোলাইটস এর মাত্রার তারতম্য হয়।

৭. ইউরিনে প্রোটিন ক্রিয়েটিনাইন অনুপাত।

৮. এক্স-রে কে ইউ বি (KUB): এক্স-রে কে ইউ বি দিয়ে আমরা কিডনি বা মূত্রনালীতে কোন পাথর আছে কিনা বুঝতে পারি।

৯. আই ভি ইউ (IVU): ইন্ট্রাভেনাস ইউরোগ্রাম (আইভিইউ) কিডনি, মূত্রাশয় এবং মূত্রনালীর অস্বাভাবিকতাগুলি দেখার জন্য ব্যবহৃত একটি উন্নতমানের রেডিওলজিক্যাল পদ্ধতি।

১০. আল্ট্রাসনোগ্রাম কে ইউ বি (USG of KUB): আল্ট্রাসোনোগ্রাম কে ইউ বি দিয়ে আমরা কিডনি বা মূত্রনালীতে কোন পাথর বা টিউমার আছে কিনা বুঝতে পারি। এছাড়া কিডনির আকার ও কার্যকারিতার ও একটি ধারণা পাওয়া যায়।

১১. রেনোগ্রাম (Renogram): একটি নিউক্লিয়ার মেডিসিন রেণোগ্রাম একটি বিশেষ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করে সঞ্চালিত হয় যা রক্ত প্রবাহে ইনজেকশন করলে কিডনি রক্ত সরবরাহ এবং কীডনিগুলির ফিল্টারিং ক্রিয়াকলাপ দেখায়।

১২. ইউরিন ফর রুটিন এক্সামিনেশন (Urine R/E): ইউরিন আর ই এর মাধ্যমে ইউরিন ইনফেকশন, ইউরিন দিয়ে রক্ত, গ্লুকোজ, প্রোটিন যাওয়া সহ বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

গ) থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট (Thyroid Function tests):

শরীরে থাইরয়েড হরমোন এর কার্যকারিতা দেখতে নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলো করা হয়-

১। রক্তের টোটাল টি-৩ (T-3) লেভেল।

২। রক্তের টোটাল টি-৪ T-4) লেভেল।

৩। রক্তের টি এস এইচ (TSH) লেভেল।

৪। ফ্রি টি-৩ এন্ড টি-৪ লেভেল।

৫। থাইরয়েড স্ক্যান।

৬। রেডিওএক্টিভ আয়োডিন আপটেক।

হাইপো থাইরোয়েডিজম (থাইরয়েড হরমোন এর অভাব) রোগে রক্তের টি-৩ ও টি-৪ লেভেল কমে যায় এবং রক্তের টি এস এইচ লেভেল বেড়ে যায়।

হাইপার থাইরোয়েডিজম (থাইরয়েড হরমোন এর পরিমান বেশি) রোগে রক্তের টি-৩ ও টি-৪ লেভেল বেড়ে যায় এবং রক্তের টি এস এইচ লেভেল কমে যায়।

ঘ) ডায়াবেটিস রোগ নির্ণয়ের পরীক্ষা:

১। খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজ (Fasting blood glucose): খালি পেটে রক্তের গ্লুকোজ এর মাত্রা ৭ মিলিমোল/ লিটার বা তার বেশি হলে রুগীর ডায়াবেটিস রোগ আছে।

২। খাবার ২ ঘন্টা পরে রক্তের গ্লুকোজ (Blood glucose 2 hrs after breakfast): খাবার ২ ঘন্টা পরে রক্তের গ্লুকোজ ১১.১ মিলিমোল/ লিটার বা তার বেশি হলে রুগীর ডায়াবেটিস রোগ আছে।

৩। এইচ বি এ ১ সি (HbA1C): রক্তে এইচ বি এ ১ সি এর মাত্রা ৬.৫% বা বা তার বেশি হলে রুগীর ডায়াবেটিস রোগ আছে।

ডায়াবেটিস রুগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পরীক্ষা সমূহও করে নেয়া হয়:

১। খালি পেটে রক্তের চর্বি (Fasting lipid profile)

২। সিরাম ক্রিয়েটিনিন

৩। ই সি জি

৪। ইউরিন ফর রুটিন এক্সামিনেশন (Urine R/E)

৬। ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইল/ খালি পেটে রক্তের চর্বি (Fasting lipid profile)

ফাস্টিং লিপিড প্রোফাইলের উপাদানসমূহ হলো:

১. সিরাম কোলেস্টেরল (রক্তে নর্মাল মাত্রা <২০০ মি.গ্রা /ডি এল)

২. এইচ ডি এল কোলেস্টেরল (রক্তে নর্মাল মাত্রা ৩৫-৬০ মি.গ্রা /ডি এল)

৩. এল ডি এল কোলেস্টেরল (রক্তে নর্মাল মাত্রা <১৩০ মি.গ্রা /ডি এল)

৪. ট্রাইগ্লিসেরাইড (রক্তে নর্মাল মাত্রা <১৫০ মি.গ্রা /ডি এল)

তন্মধ্যে এইচ ডি এল কোলেস্টেরলকে ভালো কোলেস্টেরল বলা হয় কারণ এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং এল ডি এল কোলেস্টেরলকে খারাপ কোলেস্টেরল বলা হয় কারণ এটি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। মগজ, কলিজা, বড় চিঙড়ি ও ডিমের কুসুমে এল ডি এল কোলেস্টেরল বেশি থাকে।